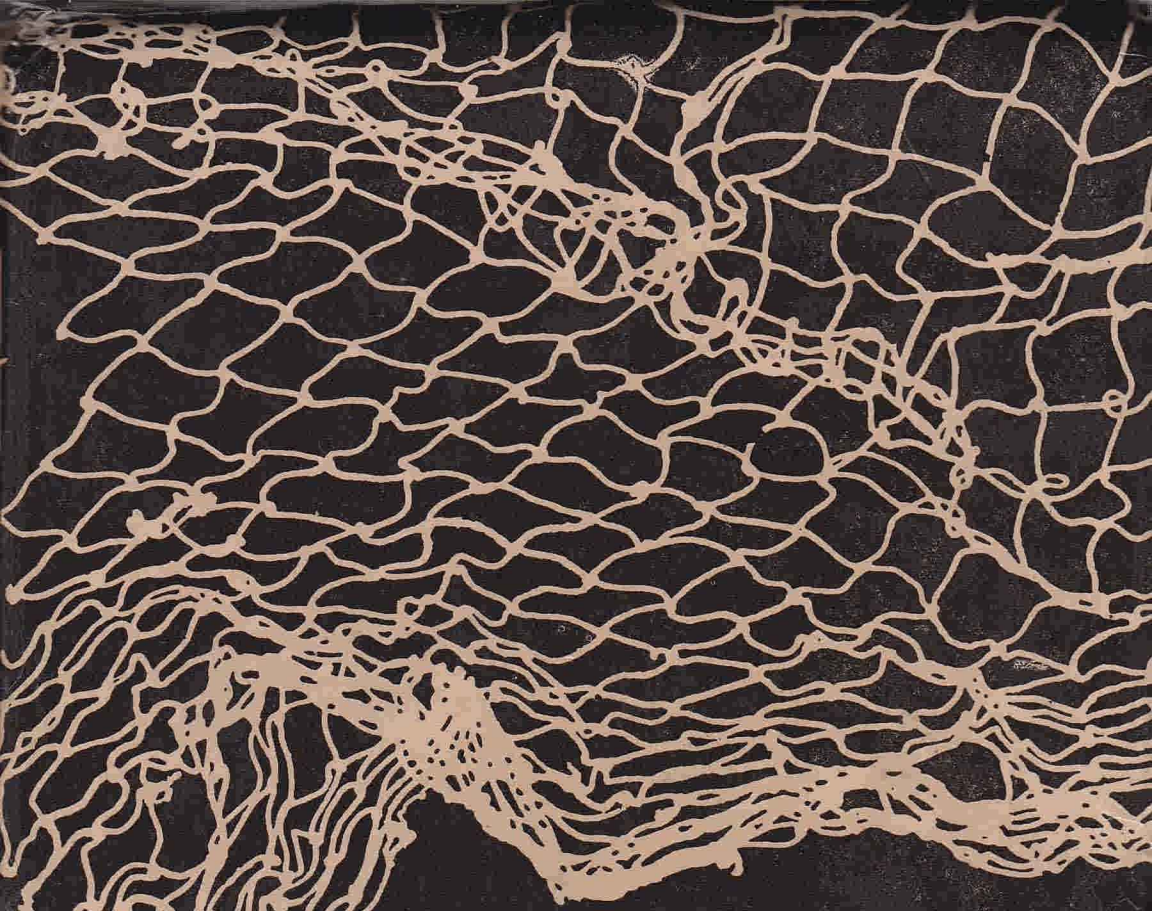

জাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের অন্যান্য বই

ঘুণপোকা
পারাপার
কাগজের বউ
আশ্চর্য ভ্রমণ
যাও পাখি
দিন যায়
শ্যাওলা
লাল নীল মানুষ
ক্ষয়
ফজল আলি আসছে
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
ফুল চোর
শিউলির গন্ধ

আপনাদের কাছে আমার অনেক কথা বলার আছে। আপনারা শুনবেন কি ? প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এখন আমার সময়টা খুব খুব খারাপ যাচ্ছে। অবশ্য ভেবে দেখলে, আমার জীবনের কোনো সময়টাই তেমন ভাল কাটেনি। লাইফটা আগাগোড়াই যাকে বলে হেল।

এক মিনিট···দোতলায় ফোন বাজছে না ? দাঁড়ান আমি টেলিফোনটার জবাব দিয়ে আসি।

না মশাই, ফোন আমার নয়। এ বাড়ি আমার নয়। এইসব সোফা টেবিল চেয়ার কার্পেট এসব কিছুই আমার নয়। এসব বোস বাবুদের। তাঁরা মাসখানেকের জন্য বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমি তাঁদের বাড়ি, কুকুর এবং অ্যাকোরিয়ামের মাছ পাহারা দিই। বিশেষ করে কুকুর এবং মাছ। যেমন তেমন কুকুর নয়। অ্যালসেশিয়ান এবং কুলীন। শুনেছিলাম (কার কাছে বলতে পারব না) যে, অ্যালশেসিয়ান আদপে কুকুরই নয়, নেকড়ে আর শেয়ালের দো-আঁশলা। একদিন কথাটা বলে ফেলায় গদাই বোস ভারী চটে উঠে বলেছিলেন, নেকড়ে ঠিক আছে, কিন্তু শেয়াল কভি নেহি।

আমি তর্ক করিনি। বাস্তবিক অ্যালসেশিয়ানের জন্মবৃত্তান্ত তো আমি জানি না। কিন্তু কুকুরটা যে খুবই ভাল জাতের যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম ভাল জাতের কুকুরকে রেল কোম্পানি ট্রেনে চড়তে দেবে না, হোটেলেও ঢুকতে না দিতে পারে। সুতরাং বেড়াতে বেরোনোর আগে গদাই বোস এবং তার পরিবারশুদ্ধু সকলেই বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। অবশেষে কার যেন আমার কথা মনে পড়ল, ডাক ডাক কানুকে।

আমিই কানু। কানু লাহিড়ি। সঠিক অর্থে আমাকে ব্রাহ্মণ বলতে আপনারা চাইবেন কিনা জানি না, তবে আমি বারেন্দ্র বটি। লাহিড়িদের মধ্যে অনেকেই বেশ নাম করা লোক। ধনী লাহিড়িদের কথাও আমি বিস্তর শুনেছি। তবে আমরা ধনী বা যশস্বী লাহিড়িদের কেউ নই। আমরা গরীব এবং নিতান্তই এলেবেলে লাহিড়ি। আমাদের মতো তুচ্ছ লাহিড়িদের কথা জানতে পারলে যশস্বী ও ধনী লাহিড়িরা নিশ্চয়ই ঘেন্নায় নাক সিঁটকোবেন বা অবহেলায় মুখ

ফিরিয়ে নেবেন। পারতপক্ষে তাই আমি ধনী এবং যশস্বী লাহিড়িদের কাছে ঘেঁষি না, পাছে তাঁরা দেখে অবাক হন যে, এখনো পৃথিবীতে এইসব গরিব ও তুচ্ছ লাহিড়িরা আছে এবং লাহিড়িদের নাম ডোবাচ্ছে। এবং সেইমত সম্ভ্রান্ত লাহিড়িরা যদি জানতে পারেন যে, লাহিড়ি বংশ অবতংস জনৈক কানু লাহিড়ি ডাক্তার গদাই বোসের কুকুর পাহারা দেয় তাহলে তাঁরা নিজেদের মুখ আয়নায় দেখতে অবধি লজ্জা পাবেন।

দাঁড়ান···এক মিনিট···

হ্যালো।

গদাধর বোসের বাড়ি কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি মিলির বান্ধবী, ওকে একটু ডেকে দেবেন?

মিলিরা এখানে নেই। বেড়াতে গেছে।

ওমা! কবে গেল? কোথায়?

পনেরো দিন হল গেছে। অনেক জায়গায় যাওয়ার কথা। গোটা উত্তর ভারত।

তাহলে আমার কী হবে?

আপনার প্রবলেমটা কী?

আপনি কে বলছেন বলুন তো! মিলির মামা নাকি?

আজ্ঞে না। মিলির মামাও গেছেন।

আপনি তাহলে কে?

ইয়ে, কেয়ারটেকার বলতে পারেন।

মিলিটা এমন পাজি, আমাকে একটা খবরও দিয়ে গেল না।

আমি যতদূর জানি, গদাই বোস খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, এক মাসের জন্য উনি বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন এবং এক মাস ওঁর দুটো চেম্বারই বন্ধ থাকবে। ওঁর রুগীরা যেন ডাক্তার শুভাশিস মিত্রর চেম্বারে যায়, সেখানে পুরোনো রুগীদের কেস হিস্ট্রি উনি রেখে যাবেন।

বিজ্ঞাপনটা আমি দেখিনি। সে যাকগে, কিন্তু আমার বই তিনটের কী হবে বলুন তো!

কিসের বই?

একটা লুডলাম, একটা হেলি আর একটার লেখকের নাম মনে নেই, তবে বইটির নাম ভ্যালি অব দি ডলস। তিনটেই মিলি ধার নিয়েছিল। কিন্তু এখন

বইগুলো আমার ভীষণ দরকার।

আমি যতদূর জানি, তিনটে বই-ই মিলি সঙ্গে নিয়ে গেছে। ট্রেন জার্নি তো ভীষণ বোরিং হয় জানেন।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু রত্না মাসীকে আমি এখন কী বলব? বইগুলো ওঁর এক জায়ের। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বইগুলো যখন আনি তখন মাসীর সঙ্গে তার জায়ের বেশ ভাবসাব ছিল। হঠাৎ দিন সাতেক আগে ওঁদের মধ্যে ফাটাফাটি ঝগড়া হয়ে গেছে। বাড়ি অবধি ভাগাভাগি কমপ্লিট, এখন জা দিনরাত যখন তখন বইগুলোর জন্য মাসীকে তাগাদা দিচ্ছেন। এমনকি সাইকোলজিক্যাল প্রেশার ক্রিয়েট করার জন্য রাত বারোটায় ঝিকে দিয়ে কলিংবেল টেপাচ্ছেন। ঝি পর্যন্ত মাঝরাতে বইগুলোর জন্য তাগাদা দিচ্ছে। মাসী তিনটে করে কামপোজ খেয়েও ঘুমোতে পারছে না। এমনিতেই বেচারার ঘুম পলকা। তার ওপর···আচ্ছা আমি গিয়ে একটু খুঁজে দেখব? বাই চান্স যদি বইগুলো ভুলে ফেলে গিয়ে থাকে!

আপনি এসে খুঁজে দেখতে পারেন। কিন্তু মিলি যে বড় একটা চামড়ার ব্যাগ লেক্সপো থেকে সাড়ে তিনশো টাকায় কিনেছে সেটা কি দেখেছেন?

কিনেছে? দেখুন তো কী পাজি, আমাকে একটুও জানতে দেয়নি। ঠিক আছে, আমি কাঠমাণ্ডু থেকে আমার কাকাকে দিয়ে স্যামসোনাইট আনাবো। তখন বুঝবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তা সেই ব্যাগটা কিন্তু বিশাল। আমি নিজে দেখেছি তার মধ্যে মিলি তার নিজস্ব টুথব্রাশ, দাবার ছক, চার রকমের উল আর চার রকমের চার জোড়া কাঁটা, এক গোছা টিনটিন-এর কমিকস্ আর সাতটা বই ভরে নিয়ে গেছে। তার মধ্যে আপনার তিনটে।

কিন্তু এখন আমার মাসীর কী হবে? সারাদিন টেনশন, রাতে ঘুম নেই। ইস, মিলিটা এত পাজি না····

একটা ব্যাপারে আমি হেল্প করতে পারি।

পারেন? বাঁচালেন।

আমি আপনার মাসীর জন্য খুব স্ট্রং ঘুমের ওষুধ দিতে পারি। এ বাড়িতে ওষুধের অভাব নেই। মেলা ওষুধ।

যাঃ, ওটা একটা হেল্প হল নাকি? আর শুধু ঘুমোলেই তো চলবে না। আমার মাসীর কত কাজ। হাজারটা সোসাইটির মেম্বার। এই ব্লাড ডোনেট করছে, এই অ্যামনেস্টির জন্য টাকা তুলছে, ফাংশন অর্গানাইজ করছে···

ফোনটা একটু ধরবেন কাইগুলি ? গমের খিচুড়িটা বোধহয় পুড়ে যাচ্ছে।

গমের খিচুড়ি ? গমের আবার খিচুড়ি হয় নাকি ? যাঃ।

হয়। গরীবরা খায়। আধভাঙা গম আর ডাল দিয়ে করে। নাম ডালিয়া। তবে এটা সে খিচুড়ি নয়।

তাহলে ?

এটা গদাইবাবুদের কুকুরের জন্য। গম, মাংসের হাড় আর ছাঁট এবং কয়েকটা ভিটামিন। আসছি, ছেড়ে দেবেন না যেন।

কিন্তু আমার তো কথা শেষ হয়ে গেছে !

আমার হয়নি। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।

যাঃ ! এই শুনুন, শুনুন···

আমি শুনলাম না। কয়েকটা লাফ মেরে রান্নাঘরে পৌঁছে, গ্যাসটা বন্ধ করলাম। বাস্তবিকই খিচুড়িটা ধরে এসেছিল। জিম অত্যন্ত খুঁতখুঁতে কুকুর। একটু ধরা গন্ধ হলেই আর খেতে চাইবে না। খিচুড়িটা নামিয়ে আমি আবার লাফ দিয়ে এসে ফোন ধরলাম।

হ্যালো।

হ্যালো ! খিচুড়িটা কি পুড়ে গেছে ?

না। আর একটু হলেই যেত।

কুকুরের খিচুড়ির রেসিপিটা কী বললেন যেন ! আর একবার বলবেন ?

কেন ? আপনারও কি কুকুর আছে ?

তিনটে। একটা ডালমেশিয়ান, একটা ফক্স টেরিয়ার, একটা বুলডগ।

তাদের খাওয়ায় কে ?

কীপার আছে, ডগ কীপার।

তাহলে আপনার রেসিপি জানার দরকার কী ?

জাস্ট একটা ইন্টারেস্ট।

আধভাঙা গম, মাংসের ছাঁট আর হাড়, কয়েকটা ভিটামিন। তবে কী কী ভিটামিন তা বলতে পারব না। ডাক্তারবাবু ভিটামিনের একটা মিকশ্চার তৈরি করে দিয়ে গেছেন, আমি চামচে মেপে খিচুড়িতে মিশিয়ে দিই।

বাই দি বাই, আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে, আপনি এখনো আপনার নামটা আমাকে বলেননি।

আপনিও বলেননি।

আমার নাম যাজ্ঞসেনী আয়ার। আয়ার বলতে আবার অন্য কিছু ভাববেন

না। আমরা চার পুরুষে বাঙালী।

আমি সুবীর লাহিড়ি। সবাই কানু বলে ডাকে।

আপনি মিলির কে হন ?

কেউ না। পাড়ার ছেলে।

বয় ফ্রেণ্ড নাকি ?

আরে না। মিলি অনেক উঁচু থাকের মেয়ে। স্ট্যাটাসে আমি অনেক নীচু জাতের। ফ্রেণ্ডশীপ হয় না।

আহা, মিলি এমন কিছু হাই স্ট্যাটাসের মেয়ে নয় মোটেই।একটু হাই ব্রাউড মে বি। ব্রাইটও নয় তেমন।

তাহলে যাজ্ঞসেনী, আপনার স্ট্যাটাস নিশ্চয়ই আরও উঁচু ?

ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামায় বলুন ? আমি একদম স্ট্যাটাস কনশাস নই। আমার ফ্রেণ্ডদের মধ্যে অনেক মিডলক্লাস রয়েছে। এমন কি তাদের মধ্যে কয়েকজন কমিউনিস্টও। আচ্ছা, আপনি আমাকে কী বলবেন বলছিলেন যে ! বললেন অনেক কথা আছে।

সেসব ফ্যাদরা প্যাচাল।

তার মানে ? ইজ ইট ফ্রেঞ্চ ?

আরে না। ফ্যাদরা প্যাচাল মানে হল আংসাং কথাবার্তা।

আংসাং মাস্ট বি চাইনিজ ?

তাও নয়, যাজ্ঞসেনী, এ হল বাংলা স্ল্যাং। মানে হল, ননসেন্স টক।

হি হি। কথাটা আর একবার বলবেন ? আমি নোট করে নেব। ফ্যাদরা কী যেন ?

ফ্যাদরা প্যাচাল।

মিনিং ননসেন্স টক ?

অনেকটা তাই।

আর যেন কী বললেন ?

আংসাং কথা। এই যেমন এখন আমরা বলছি আর কি।

মোটেই না, আমি মোটেই আংসাং বকছি না। খুব প্রয়োজনীয় কথাই বলতে চাইছি।

আহা, আপনি নন, আমি। পনেরোদিন হল একা এত বড় বাড়িতে থেকে থেকে আমার মেলা কথা জমে গেছে।

কেন, আপনার ফ্রেণ্ড সারকেল নেই ? তাদের নিয়ে এসে আড্ডা মারুন।

মুশকিল হচ্ছে, ডাক্তার বোস ওটা বারণ করে গেছেন। কুকুরটাও বাইরের লোক একদম পছন্দ করে না। ভীষণ চেঁচায়। গলার জোরও সাংঘাতিক। আমার বেশির ভাগ বন্ধুরই কুকুর ফোবিয়া আছে।

কুকুরটা আপনাকে কিছু বলে না?

না। তার কারণ একসময়ে আমি মিলিকে পড়াতাম।। এখন ওর ছোটো ভাই ভাস্করকে পড়াই। কুকুরটা আমাকে চেনে।

তাই বলুন, আপনি ওদের বাড়ির টিউটর। মিলি আমাকে বলেছিল, ওর কোন্ টিউটর যেন ওকে মাঝে মাঝে লাভ লেটার দেয়। সে কি আপনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ যাজ্ঞসেনী, আমিই।

ছিঃ। আপনার টেস্ট খুব লো। মিলিকে লাভ লেটার দেওয়ার কী আছে? দাঁত উঁচু, কালো, বিচ্ছিরি, তার ওপর অত দেমাক।

ইয়ে, ব্যাপারটা হল, ঠিক মিলিকে নয়, আমি ওকে উপলক্ষ করে লাভ লেটার দিই ওদের টাকা পয়সাকে। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে আমার কিছু সুবিধে হত। তবে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, মিলি সেসব চিঠির জবাব দেয়নি। পাত্তাও দেয়নি।

হি হি। আপনি খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার তো। ও যখন আমাকে বলেছিল যে ওর টিউটর ওকে লাভ লেটার দেয় তখন আমারও এরকমই একটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মিলিরা এমন কি বড়লোক বলুন তো! ডাক্তার বোস কত টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেয়?

তা আমি জানি না। কিন্তু আমার মতো গরীবের চোখে ওরা বেশ বড়লোক। ব্যাপারটা রিলেটিভ তো। আপনাদের তুলনায় হয়তো মিলিরা বেশ গরিব।

থাকগে। এখন আমার মাসীর জন্য কী করা যায় বলুন তো।

আপনার তো অনেক টাকা।

টাকা! টাকার কথা কেন?

বলছিলাম কি, বই তিনটে কিনে দিলে হয় না? এমন কিছু রেয়ার বুকও তো নয়। লুডলাম, হেলি এদের বই সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মাই গড! ইউ আর রিয়েলি স্মার্ট! একথাটা আমার একদম মাথায় আসছিল না। তাই তো, কিনে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। থ্যাংক ইউ,থ্যাংক ইউ,ভেরি মাচ।

আপনাকেও থ্যাংক ইউ। অনেকক্ষণ আমার ফ্যাদরা প্যাচাল শুনলেন। মোটেই ফ্যাদরা প্যাচাল নয়। আপনার কথাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। আমি

একদিন টুক করে চলে যেতে পারি মিলিদের বাড়ি মিলি আসবার আগেই?

হোয়াই নট? আপনার আপত্তি নেই তো?

না,না, মোটেই না।

শুনুন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে পিকনিকে যাব বলে ঠিক করেছিলাম। জায়গাটা ঠিক করতে পারছিলাম না। এখনই মনে হল, পিকনিকটা আমরা মিলিদের বাড়িতেই তো করতে পারি। খুব ভাল হবে না?

ইয়ে, ডাক্তার বোস···

না, না, ডাক্তার বোস কিছু মাইণ্ড করবেন না। যদি শোনেন যে এম· ভি· আয়ারের মেয়ে আর তার বন্ধুরা ওঁর বাড়িতে পিকনিক করে গেছে তাহলে উনি বরং খুশীই হবেন। আমার বাবা বিগ ম্যান। ভেরী বিগ। আজ ছাড়ছি।

যাজ্ঞসেনী আয়ার লাইন কেটে দিল।

বেলা বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। ঠিক সাড়ে বারোটায় জিম খাবে। যাকে বলা যায় ডগ অফ ডি ডগস, জিম হল তাই! সময়মতো তার খিদে পায়। খিদে পেলে সে কখনো লাফালাফি চেঁচামেচি করে না। একবার শুধু ঘ্রাউ করে গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ে। আমি তখন তার গলার শিকল খুলে দিই। জিম নিঃশব্দে তার নিজস্ব অ্যালুমিনিয়ামের কানা-উঁচু বড় বাটিটা মুখে নিয়ে ছাদের সিঁড়িতে চলে যায় এবং অপেক্ষা করে। ওই বাটিতে তার খাবার ঢেলে দিতে হয়। ছাদের সিঁড়ি ছাড়া আর কোথাও বা নিজস্ব বাটি ছাড়া আর কিছুতে কিংবা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য কখনও সে খাবে না।

হাতে একটু সময় আছে দেখে আমি টেপ-ডেক-এ একটা ক্যাসেট ভরে স্টিরিওটা চালিয়ে দিই এবং ডিভানে আধশোয়া হয়ে বসে থাকি। এই বড়লোকিপনা আমি খুব উপভোগ করছি বলে কেউ মনে করলে ভুল করবেন। আসলে মানুষ তখনই কোনো আনন্দ বা আরাম উপভোগ করতে পারে যখন সে কোনো স্মৃতির দ্বারা তাড়িত না হয়। এই যে প্যাট বুন-এর মোহময় গলার গান, এই যে নরম ডিভান, দোতলার জানালার বাইরে শীতের রোদ, এ সবই আমি উপভোগ করতে পারতাম যদি আমার স্মৃতি না থাকত। আর সেই স্মৃতি যদি না হত এমন বিদঘুটে। আপনারা কি আমার কথা একটু শুনবেন?

একটা দিনের কথা বলি। সন্ধেবেলা সরলামাসীদের বাড়ি সত্যনারায়ণের পুজো। আমাদের সাত ভাইবোন মার সঙ্গে গেছি। বিকেল থেকে পেট খাঁ খাঁ।

বার বার ঢোঁক গিলছি খিদেয়, লোভে। বড়দিকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করছি, কখন দেবে রে?

দেবে, দেবে। চুপ!

আমি আরো গলা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি, বড়দি, এই পুজোয় কি লুচি হয়? আলুর দম?

যাঃ! শুধু ফল বাতাসা আর সিন্নি।

সিন্নি কি অনেকটা দেবে? যত খাবো তত?

দেবে। দেখ না।

তা সরলামাসীরা সেবার সিন্নী দিতে কার্পণ্য করেনি। পরে জেনেছিলাম গম পেষাই কলের কিছু আটা বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছিল বলে মেসো সন্ধ্যায় এক বস্তা কিনে এনেছিলেন। তাই সিন্নি হয়েছিল দেদার। চারদিকে থিকথিকে কাদা, বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে খোলা বারান্দায় বসে আমরা সাত ভাইবোন কলাপাতায় ফলের টুকরো, বাতাসা আর সিন্নি খাচ্ছি হ্যারিকেনের আলোয়—দৃশ্যটা এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই। সিন্নিতে আটাই ছিল বারো আনা। কিন্তু তাই বা কে দেয় আমাদের? সাপটে সিন্নি চালিয়ে দিচ্ছিলাম। জানতাম রাতে বাড়িতে ভাত হবে না।

আইঢাই হয়ে ফিরে আসার পর রাত তিনটে নাগাদ আমার বড়দির ভেদবমি শুরু হল। সরলামাসীদের দোষ দেওয়া উচিত হবে না। বড়দির রক্ত আমাশা চলছিল, সে খবর চেপে রেখে ওই পচা আটার সিন্নি গিলেছিল গলা অবধি। ভোরবেলা হোমিওপ্যাথ এল, হোমিওপ্যাথ ছাড়া আমাদের উপায়ও ছিল না। কিন্তু তার ওষুধে কাজ হল না। হাসপাতালে পরদিন সন্ধেবেলা বড়দি মরে গেল।

দুঃখের কথা বলতে যত ভাল, শুনতে তত নয়। তাই না? তাহলে ডিটেলসে গিয়ে লাভ নেই। সংক্ষেপে বলে নিই আমাদের সাত ভাইবোনের চারজনই ওরকমভাবে—মোটামুটি অভাবজনিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে মরে গেছে। আছি আমরা মাত্র চারজন। রোগে ভোগে মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে, খেয়ে না খেয়ে আমরা চারজন টিকে আছি এখনো।

অ্যাকোরিয়ামে একটা কালো মাছ রহস্যজনকভাবে ভেসে আছে না? হ্যাঁ, ঠিক তাই। দু আঙুলে টিপে ধরে মাছটাকে বের করে আনি। মরে গেছে। কী করে মরল সেটা বলা মুশকিল। তবে পেটের কাছ থেকে সুতোর মতো সরু একটা কেঁচোর অর্ধেকটা বেরিয়ে ঝুলছে। মাছটা অতিভোজনে মরল কিনা তা

বুঝতে পারছি না। কেঁচোর পাত্রটায় আরো সব মাছ ভিড় করে টুকছে। গদাই বোসের বউ আমাকে বলে গেছল, কেঁচোটা খুব বেশীক্ষণ রেখো না, বড্ড বেশী খেয়ে ফেলে ওরা।

কেঁচোর পাত্রটা আমি সরিয়ে দিই।

কিন্তু মাছটা এখন আমি কী করব? এসব বাহারী মাছ মানুষে খায় বলে জানি না। কিন্তু আমি যে ঘরের ছেলে সে ঘরে কিছুই ফেলার নিয়ম নেই। আমার মা পেঁপের খোসা, আলুর চোকলা, মাছের পাখনা কিছুই ফেলে না। কোনো ভাবে না কোনোভাবে আমরা সেটা খেয়ে নিই। এই মাছটা মানুষের খাওয়ার মতো যদি নাও হয় একটা উপোসী বেড়াল নিশ্চয়ই খেতে পারবে। কিংবা কুকুর?

ঘ্রাউ! ঘ্রাউ!

জিম!

আমি বারান্দায় গিয়ে জিমের শেকল খুলে দিই। জিম নিঃশব্দে তার বাটি মুখে নিয়ে সিঁড়ির চাতালে চলে যায়। আমি তার খাবারটা নিয়ে গিয়ে বাটিতে ঢেলে দিই।

জিম মুখ নিচু করে শোঁকে। তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়। সেই চোখে ঘৃণা। আমি চমকে উঠি। কুকুরের চোখে এরকম সুস্পষ্ট ঘৃণার প্রকাশ আমি আর কখনো দেখিনি। খিচুড়িটা স্পর্শও করল না জিম, মুখ তুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে। জিম যে এলেবেলে এবং গরীব কুকুর নয়, জিম যে অত্যন্ত সুশৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং তার সঙ্গে যে ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই চলবে না সেটা আর একবার টের পেয়ে আমি গরম খিচুড়িতে হাত ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি কালো মাছটা বের করে আনি।

ঘাট হয়েছে বাপু জিম, এবার খাও।

জিম সংক্ষিপ্ত একটা শব্দ উচ্চারণ করল, ঘ্রাউ!

বঙ্কিমের কমলাকান্তের মত এক দিব্যকর্ণ পেয়ে যাই আমি। জিমের কথাটা বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। সে বলছে, এটা কী হল হে?

আমি বিনয়ের সঙ্গে জিমকে বললাম,বুঝতে পারিনি জিম। আমার বিশ্বাস ছিল এই মাছটায় হাই প্রোটিন আছে।

জিম আর খিচুড়ি স্পর্শ করল না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে নিজের শিকলের কাছে শুয়ে রইল। নিজেকে ভারি বেকুব বলে মনে হল আমার।

এই জীবনটার কথা যা বলছিলাম আপনাদের, অত্যন্ত ট্র্যাজিক। গান্ধীজী

যখন সেই ইংরেজ আমলে দেশের লোককে অসহযোগ শিখিয়েছিলেন তখন তিনি বুঝতেও পারেননি যে, সেই অসহযোগের ঠেলা কতদূর গড়াবে। গান্ধীবাদ লোকে ভুলেই গেছে কিংবা গান্ধীবাদ কী জিনিস লোকে কখনো খুঁজে বা বুঝে দেখবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু অসহযোগ জিনিসটা পাবলিক খুব খেয়েছে। গোটা দেশটার সর্বাঙ্গে সেই অসহযোগের খোসপাঁচড়া। কলকারখানা বন্ধ হয়, সরকারী অফিসে কাজ হয় না, ট্রেন সময়মতো পৌঁছোয় না, আরো কত কী। আমার বাবা মেলা কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রেট বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে একটা চাকরি পেয়েছিল। খুব ভাল চাকরি নয়, তবে ওটা দিয়ে বেঁচে থাকা যেত। সেই গ্রেট বৃটেনে একদিন ধর্মঘট শুরু হল এবং তার অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়াল বাবা। যতদূর জানি সেই ধর্মঘটে সকলে সামিল হয়নি। যারা কারখানায় ঢুকবার চেষ্টা করত তাদের মারধর করতে শুরু করল ধর্মঘটীরা। বাবা একদিন এরকম একজনের মাথা ইঁট দিয়ে ফাটিয়ে খুব সহাস্যবদনে বাড়ি ফিরে বললেন, দিয়েছি এক শালাকে আজ শেষ করে। বাবার মুখে সেই বোধহয় আমি শেষবার হাসি দেখেছি। একটু পাগলাটে, ক্ষ্যাপা, মরীয়া হাসি।

তারপর আর হাসি ছিল না বাবার মুখে। গ্রেট বৃটিশ খুলল না। অত বড় কারখানার বিশাল যন্ত্রপাতিতে মরচে পড়তে লাগল, ব্যাঙের ছাতা আর গাছ গজাতে লাগল। মাড়োয়ারি মালিকরা গুজরাটে নতুন কারখানা খুলল। হাজারটা মিটিং দৌড়োদৌড়ি, প্রতি দিন আশা নিরাশার দোল একটা বন্ধ কারখানাকে নিয়ে আমাদেরও ভাবিয়ে তুলল। এই শুনি, খুলবে। মালিকরা নরম হয়েছে। ফের শোনা যায়, নাঃ, নতুন ফ্যাকড়া উঠেছে। কী করে একটা বন্ধ কারখানাকে খুলে দেওয়া যায়, সেটা আজও রহস্য, আজও এক জ্বলন্ত প্রশ্ন। আর সেই কারখানার সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত আমরা এক পরিবারের জনা দশবারো প্রাণীর প্রাণপাখি যখন ডানা ঝাপটাচ্ছে তখন আমরা নানাভাবে প্রশ্নটা ভেবে দেখেছি। আজও সদুত্তর পাইনি।

গ্রেট বৃটিশের হাজার কয়েক কর্মচারীর কার কী দশা হয়েছিল তা আমরা আজও জানি না। তবে বাবা বিড়ি বাঁধা থেকে গামছা ফিরি সবই করেছিল। মাঝে মাঝে হাত পাতাও।

ক্রিরিং!

কলিং বেল।

জিমের বকলসে শিকল পরিয়ে দিয়ে নীচে নেমে দরজাটা খুলে দিই। বৈঠকখানার প্রকাণ্ড সদর দরজার ফ্রেম-এ ফুলকাটা পাপোষের ওপর রোগা,

ফ্রক পরা, ভয়ার্ত মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। তার জামায় অনেক সেলাই, তেলের অভাবে রুক্ষ লালচে চুল, পায়ে তাপ্পি দেওয়া ক্ষয়াটে হাওয়াই চটি। ডানহাতে গামছায় বাঁধা একটা কলাই করা থালা। এ বাড়িতে ঝি হিসেবেও মেয়েটা বেমানান।

জিম চেঁচাচ্ছে। ভয়ংকর গলায় রক্তজল করা ধমক। দোতলার বারান্দা থেকেও সে সবই টের পায়। আগন্তুকের পদসঞ্চার, শ্বাস, ঘ্রাণ।

কুকুরটা ছাড়া নেই তো মেজদা?

না, আয়। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আসিস।

কলমী শাকের চচ্চড়ি দিয়ে রেশনের মোটা আতপচালের ভাত সোনা হেন মুখ করে খেয়ে নেওয়া আমার কাছে শক্ত কাজ কিছু নয়। তাছাড়া খাচ্ছি ঝকঝকে সানমাইকা বসানো বিরাট ডাইনিং টেবিলে। পেটে খিদেও প্রচণ্ড। কিন্তু বাস্তবিক আজ ভাতের দলা গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। জিম খায়নি। জিম আমাকে ঘৃণা করে। অ্যাকোরিয়ামের মরা মাছটা ওর খাবারে মেশানো ঠিক হয়নি আমার।

বরফ খাব, মেজদা?

খা।

কুকুরটা কিন্তু তাকিয়ে আছে।

কিছু করবে না, যা।

খুব ভয়ে ভয়ে কুসুম গিয়ে ফ্রিজ খুলল। গদাই বোসের বউ ফ্রিজ যথারীতি বন্ধ করে দিয়ে গেছে। আমি চালু করেছি। গদাই বোসের বউ বাড়ির অধিকাংশ ঘরে তালা দিয়ে গেছে, হরণযোগ্য প্রায় কোনো জিনিসই বাইরে অসাবধানে ফেলে যায়নি। শুধু কি করে যেন প্রায় এক কিলো একটা চিনির কৌটো ডাইনিং হলের ফ্রিজের ওপর রয়ে গেছে। সেই চিনি দিয়ে আমি রোজ একটা সরবৎ তৈরি করি। তারপর সেটা ডীপ ফ্রিজের ট্রেতে ঢেলে একটা ঝাঁটার কাঠি গুঁজে রেখে দিই। জমাট বেঁধে দিব্যি কাঠিবরফের মত খেতে হয়। মিষ্টি বরফ খেতে কুসুমের যে কী আনন্দ!

কিন্তু মুশকিল হল কুসুম কোনোদিনই শান্তিতে বরফটা খেতে পারে না। বারান্দায় যেখানে জিম বাঁধা থাকে, সেখান থেকে খাওয়ার ঘরের সবটাই দেখা যায়। জিম প্রতিদিন লক্ষ্য করে, ভিতরে কী ঘটছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, জিম বোধহয় এসব কথা গদাই বোসের বউকে নালিশ করবে।

কুকুরের যে বাকশক্তি নেই তা জানি বটে, কিন্তু তবু জিমের কুটিল ও

সন্দেহপ্রবণ চোখের দৃষ্টি দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আজ অবধি পৃথিবীর কোনো কুকুর কথা বলেছে বলে জানা নেই ঠিকই, তবু কে বলতে পারে জিম সে রেকর্ড ভাঙবে না? সে নিরন্তর আমার বোনের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, কাঠিবরফ খাওয়া দেখছে এবং ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। ঘটনাটা আমার কাছে অস্বস্তিকর।

বরফ চুষতে চুষতে কুসুম অ্যাকোয়ারিয়ামটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

মেজদা দেখেছিস?

কী?

একটা সোনালী মাছ কেমন পেট উল্টে ভেসে আছে!

আমি চমকে উঠে বলি, তার মানে?

মরে গেছে বলে মনে হয়। দেখ না।

আমি হাতের ভাত ঝেড়ে উঠে পড়ি। কাছে গিয়ে দেখি, বাস্তবিকই একটা মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। মাছটা বের করে আনি এবং বাঁ হাতের তেলোয় রেখে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকি। দু-দুটো মাছের উপর্যুপরি মরে যাওয়াটা আমার মোটেই ভাল লাগে না।

কুসুম হাত বাড়িয়ে বলে, দেখি মাছটা দেতো মেজদা। ইস, মাছটা কী সুন্দর ছিল রে!

কুসুম মাছ হাতে নিতেই জিম প্রায় শিকল ছিঁড়ে ফেলে আর কী। অদ্ভুত এক ধরনের গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে, আর পাগলের মতো দাপাদাপি।

মেজদা! সভয়ে আমার কাছে সরে আসে কুসুম।

জিম! জিম! স্টপ ইট!!

ঠিক এভাবেই বোস ডাক্তার ধমকায়। তাতে যে কাজ হয় এমন নয়। জিম ভাল জাতের কুকুর হলেও যাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে তা নয়। তাকে সিট ডাউন বললে বসে না, গেট আউট বললে বেরোয় না। তবে মালিক বকলে খানিকটা দমে যায় বটে। কিন্তু আমার ধমক জিম তেমন গ্রাহ্য করল না। দাপাতেই লাগল। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ফেলার জন্য শিকলে ঝটকা টান।

ওরকম করছে কেন রে কুকুরটা?

মাছটা অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যেই আবার রেখে দে। ওদের জিনিস ধরা ছোঁয়া ও পছন্দ করছে না।

ওর জিনিস নাকি? ইঃ রে, কুকুরের আবার জিনিস!

কুকুরেরা তাই মনে করে।

বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিবি? আমার ভীষণ ভয় করছে।

আমি দরজাটা বন্ধ করে দিই। জিম তার অভিজাত গলায় মেঘগর্জনের মতো ধমক দিতে থাকে আমাদের, শেকল ছেঁড়াছেঁড়ির চেষ্টা করে। তার বোধহয় সন্দেহ হয় দরজা বন্ধ করে আমরা আরো কোনো ভয়ংকর বেয়াদপি করছি।

এঃ মা, কত ভাত ফেলেছিস মেজদা!

আজ খেতে ইচ্ছে করছে না।

কথাটা বলেই চমকে উঠি। এরকম বাক্য আমি সারা জীবনে ব্যবহার করিনি। কারণ, 'খেতে ইচ্ছে করছে না' ধরনের বাক্য কখনো আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আমাদের সর্বদাই খেতে ইচ্ছে করে এবং খিদে কদাচিৎ মেটে। কুসুমও অমার মুখে কথাটা শুনে খুব অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

আমি লাজুক গলায় বললাম, আজ কুকুরটা খেল না।

কেন?

বড়লোকের কুকুর, একটু খেয়ালী হয়।

কুকুর না খেলে তোর কী? তুই খা না! কলমী শাকটা আজ পাঁচ ফোড়ন দিয়ে রান্না হয়েছে, মিষ্টি আলু আর ধনেপাতা আছে। দারুণ টেস্ট হয়েছে। খা।

কুকুরটা খায়নি আমারই দোষে। অ্যাকোয়ারিয়ামের একটা মরা মাছ আমি ওর খাবারে মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

ও মা! কেন?

ভাবলাম মাছ তো প্রোটিন, ফেলি কেন? কুকুরটা খাক।

কুসুম কী বলবে তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। হেসে ফেলবে না দুঃখিত হবে সেটা স্থির করতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর। তারপর কাঠি বরফ চুষতে চুষতে বলল, রান্নাঘরে আচার-টাচার কিছু নেই?

না। কেন?

তোকে দোব। তোর অরুচি হয়েছে। দাঁড়া আমি একটু খুঁজে আসি।

কুসুম যে রান্নাঘরে গেছে এটা বোধহয় জিম টের পেল। বন্ধ দরজার ওপাশে সে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে প্রচণ্ড লাফালাফি করছে। শেকলটা লোহার হলেও বলবান কুকুরের ওই তীব্র ঝটকা কতক্ষণ সইতে পারবে?

রান্নাঘর থেকে কুসুম চেঁচিয়ে বলল, মেজদা, খাওয়া ছেড়ে উঠিস না। একটা জিনিস পেয়েছি।

কী রে?

পোস্ত। শিল নোড়া আছে, বেটে দিচ্ছি।

এটা অবশ্যই এক ধরনের চুরি। কিন্তু তবু আমি কুসুমকে বাধা দিই না। অনেকদিন পোস্তবাটা খাওয়া হয়নি। একটু ঝাঁঝালো সর্ষের তেল হলে তো কথাই নেই। তেলের অভাবে শুধু কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়েও খারাপ লাগবে না।

পোস্ত বাটা দিয়ে আমি যখন ভাত খাচ্ছি, তখন কুসুম ঘুরে ঘুরে ঘরের নানান জিনিস দেখছে। চোখে মুগ্ধ লোভী দৃষ্টি। ওপরের এ দুখানা ঘরে তাও তেমন দামী জিনিস কিছু নেই। দামী যা আছে সব বন্ধ ঘরগুলোর মধ্যে। তবু কুসুম সব কিছু সাবধানী হাতে ছোঁয়, শোঁকে, দেখে। রোজ।

এঁটো থালা ধুয়ে গামছায় বেঁধে রওনা হওয়ার আগে কুসুম বলল, কুকুরের জন্য তো রোজ মাংস আসে। তাই থেকে একটু নিজের জন্য করে নিতে পারিস না।

আমি মাথা নেড়ে বলি, মাংস নয়! টেংরির সাদা হাড় আর ছাঁট।

কষাইয়ের কাছ থেকে একটু মেটুলি চেয়ে দেখিস, দেবে। আর একটু মাংসওলা হাড়।

পাগল! বন্দোবস্ত করা আছে, শুধু ছাঁট আর হাড়।

তাই একটু নিজের জন্য রেঁধে নিস। আমি তোকে তেল মশলা এনে দেব।

কোথা থেকে?

সে ঠিক দেব। দেখিস।

কিছু বললাম না। তবে ছোট্ট একমুঠো বাগানটা পেরিয়ে কুসুম যখন ফটকের কাছ অবধি পৌঁছেছে তখন দোতলার বারান্দা থেকে আমি লক্ষ্য করি, ফটকের বাইরে একটু আবডাল হয়ে একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চিনি। শিবু। ওর বাবার বেশ চালু একটা মুদিখানা আছে। কুসুমের এই বয়স্রেগুটি যে তেল মশলার উৎস তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আমি ফের ডিভানটায় এসে বসি এবং অলস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। গদাই ডাক্তারের কত টাকা সেইটে আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারি না। একজন অত্যন্ত ব্যস্ত এফ আর সি এস ডাক্তারের রোজগার কম হওয়ার কথা নয়। দিনে দু তিনটে করে মেজর অপারেশন থাকে। এক একটা অপারেশনের জন্য চার পাঁচ হাজার টাকাও গদাই বোস পায় বলে শুনেছি। নিজের ছোটো নার্সিং হোম থেকেও বড় কম আসে না। মাস বা বছরের হিসেব দূরে যাক, গদাই বোসের একদিনের রোজগারেই আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

তাহলে যাজ্ঞসেনী আয়ারদের কত টাকা আছে?

ক্রিরিরিং।

জিম ডাকল না, লাফালাফি করল না। তার মানে ঝি।

বুনি সম্পর্কে আমার একটু অ্যালার্জি আছে। সে রোজই সকাল বিকেলে এসে ঘরদোর ঝাঁট পাট ধোয়া মোছা ইত্যাদি করে কুঁজোয় জল ভরে দিয়ে যায়। কিন্তু এটুকু কাজের জন্য সে যথেষ্ট বেশী সময় নেয় এবং যতক্ষণ সে থাকে ততক্ষণে আমি কাঁটা হয়ে থাকি।

দরজার বাইরে বুনি রোজ একই পোজ-এ আমার জন্য অপেক্ষা করে। দুটো এলায়িত হাত তুলে অলস ভঙ্গিতে খোঁপা বাঁধে। দুনিয়ার কোন আহাম্মক না জানে যে, এই ভঙ্গিতে মেয়েদের বুক সবচেয়ে তীব্র দেখায়। বুনির বয়স সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে বলে আমার বিশ্বাস। কালো, ছিপছিপে, তেজালো শরীর, মুখশ্রী বলে কিছু থাকলেও তা চমকপ্রদ নয়। তবে যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। পোশাক আশাক অত্যন্ত পরিপাটি, গড়পরতা ঝিয়েদের চেয়ে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন থাকে বুনি। শাড়িটি পরিষ্কার, হাত পা পরিষ্কার, দাঁতগুলো ঝকঝকে।

কী গো, ঘুমোচ্ছিলে?

বুনি প্রথম দিন থেকেই আমাকে 'তুমি' বলে। সাধারণত লক্ষীকান্তপুর, বারুইপুর বা ডায়মণ্ডহারবার থেকে যে সব কাজের মেয়েরা আসে তারা ছোটবড় নির্বিশেষে সবাইকেই 'তুমি' বলে। বুনি তাদের দলে নয়। সে অনেককেই 'আপনি' করে বলে, আমি নিজে শুনেছি। আমাকে 'তুমি' সম্বোধনের দুটো কারণ থাকতে পারে। একটা হল, এ বাড়ির প্রাইভেট টিউটর হওয়া সত্ত্বেও বুনি আমাকে নিজের শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলে ভাবে। ভাবাটা অস্বাভাবিকও নয়। দ্বিতীয় কারণটা একটু গভীর এবং রোমান্টিক। সে কারণটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বুনি ঘরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে হ্যাসবোল্ট টেনে দিল। তারপর বেশ মাখো মাখো সোহাগের গলায় বলল, অসময়ে এসে ঘুম ভাঙালুম তোমার, কিন্তু কী করব বলো, সাড়ে তিনটের গাড়ি যে ধরতেই হবে।

ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে যা।

তাড়াতে পারলে বাঁচো, না? কেন, তোমাকে কি খেয়ে ফেলছি? আচ্ছা ম্যাস্তামারা পুরুষ বাবা।

আমার কিছু বলার বা করার নেই। কপাট বন্ধ একটা বাড়ির ভিতর এক যুবতী মেয়ের উত্তপ্ত উপস্থিতির সামনে বড্ড অসহায় লাগে নিজেকে!

বুনির হাতে এখন অঢেল সময়। মোটে দুপুর দেড়টা। মুখে বললেও সাড়ে

তিনটের গাড়ি সে কোনোদিনই ধরতে যায় না। যায় চারটে পঞ্চান্নর গাড়িতে।

শোওয়ার ঘরে স্টিলের আলমারির পাল্লায় প্রমাণ সাইজের আয়না। বুনি রোজ প্রথমে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে নিজেকে দেখে।

আজও দেখছে। দেখতে দেখতে বলল, অমন হাঁ করে চেয়ে থাকো কেন বলো তো! আমি তো কালো।

আমি বুনির দিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু সেটা ভয়ে। তাকিয়ে আমি ওর গতিবিধি আঁচ করার চেষ্টা করছি, বুঝবার চেষ্টা করছি এর পর ওর লাইন অফ অ্যাপ্রোচ কী।

আহা! আবার ঢং করে ভালমানুষী দেখাতে ছাদপানে চেয়ে আছে। তাকাও গো, তাকাও। কিছু মনে করব না।

দেড়টা কিন্তু বেজে গেছে বুনি।

বাজুক না কত বাজবে। বিছানাটা যা লণ্ডভণ্ড করে রেখেছো না! বিচ্ছিরি শোওয়া তোমার। একটু সরো তো, ঝেড়েঝুড়ে দিই।

বিছানাটা পরে হবে'খন। এখন...

বড্ড বকো তুমি। একটু বসতে দেবে তো, নাকি?

আমি শ্রেণীবৈষম্যে বিশ্বাসী কিনা সেটা সঠিক ভেবে দেখিনি। তবে ডাক্তার গদাই বোসের ঠিকে ঝি আমার পাশে আমারই বিছানায় বসতে চাইছে দেখে আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। কিছুতেই বলতে পারছি না "বোসো।" তবে আমি এও জানি, বুনি শ্রেণীবৈষম্য ভেঙে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়ার জন্যই যে বিছানায় বসতে চাইছে তা নয়। একা ফাঁকা ঘরের মধ্যে তার ও আমার সম্পর্কটা নিতান্তই আদিম। আমি বুনির গা থেকে রীতিমত বন্য গন্ধ পেতে থাকি। তার মুখে লোল হাসি। চোখ মদির।

আমি বারান্দায় শিকলের শব্দ পেয়ে বলি, জিম আজ কিছু খায়নিরে বুনি।

বুনি আমার পাশে বসে একটা হাত টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, তাই নাকি?

আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, দোষটা অবশ্য আমারই। আমি না...আমি আনুপূর্বিক কাহিনীটা সবিস্তারে তাকে বলতে শুরু করি অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে। কিছু আংসাং কথাবার্তা চলতে থাকলে বুনি হয়তো অ্যাকশনে নেমে পড়বে না। ওর গা থেকে রীতিমত হলকা আসছে।

বুনি কাহিনীটা শুনেও গা করল না। আমার হাতটায় রীতিমত হাত বোলাতে

বোলাতে বলল, ছেড়ে দাও না শালা কুকুরটাকে। গিয়ে ছাইপাঁশ গুমুত খেয়ে আসুক। আচ্ছা তুমি এমন পান্তাভাত কেন গো মাস্টার? একটু বলবে? বুনিকে দেখে গরম হয় না এমন মদ্দা আমি দেখিনি বাপু।

গরম তো নয়ই, বরং আমি হাতে পায়ে রীতিমতো হিম টের পেতে থাকি। বুনি আজ বড় বাড়াবাড়ি করছে। রোজ নানারকম ছলাকলা করলেও এতটা এগোয় না। ক্রমে ক্রমে আস্পর্ধা বেড়ে আজ একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু আরও পনেরো দিন কম করেও বাকি। ততদিনে কত কী ঘটে যেতে পারে।

সরে বোস বুনি।

বুনি চোখ পাকিয়ে বলে, কেন বলো তো! জাত যাবে?

তা নয়।

আচ্ছা, ডাক্তারবাবুর ওই ফ্যাকাশে সুঁটকি মেয়েটার সঙ্গে তোমার পট খায়? ও কি একটা মেয়েমানুষ হল বাপু?

কার কথা বলছিস?

আহা, ন্যাকা! সব জানি। মিলির এমন বুক আছে, এমন মাজা? শুধু ভদ্দরলোকের মেয়ে, আর দু-চার পাতা পড়েছে, তা ছাড়া আর কী আছে বলো তো যে অমন জুলজুল করে তাকাও, চিঠি দাও! অ্যাঁ! তোমার আক্কেলটা কেমন ধারা?

বাজে কথা বলিস না। মোটেই আমি তাকাই না।

নইলে আমাকে এমন অচ্ছেদ্দা করতে না। মিলিদিদি আমাকে বলেছে।

বলেছে! কী বলেছে?

সব বলেছে তোমার কথা। বোকা কোথাকার! এই, তুমি হাত দেখতে জানো? দেখ তো আমার বিয়ে কবে।

মিলি তোকে কী বলেছে?

বলেছে মাস্টারটা বোকা। আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়।

তুই বানিয়ে বলছিস।

খিলখিল করে হেসে ওঠে বুনি। তারপর গায়ে ঢলে পড়ে বলে, না হয় বানিয়ে বললুম, কিন্তু ওই সুঁটকিটার জন্য তোমার যে একটু সুড়সুড়ি আছে তা জানি গো। মেয়েমানুষরা ওসব ঠিক টের পায়।

আমি গালে ওর গরম শ্বাস টের পেয়ে টপ করে উঠে পড়ে বলি, বিছানাটা ঝাড়বি বলছিলি যে! তাই ঝাড় বরং। আমি জিমকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।

একটা কথা বলব ?

আবার কী কথা ?

মেয়েমানুষকে অত ভয় কেন তোমার ?

সাড়ে তিনটের ট্রেন ধরতে হলে তোর কিন্তু আর সময় নেই বুনি।

আমার সময় নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সময় নিয়ে আমি কী করব বলো তো ! ঘরে কে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে আমার জন্য ? যদি আজ রাতটা থেকেও যাই এইখানে তবু কেউ খোঁজ করবে না জানো ?

আমি ভয় পেয়ে বলি, না না বুনি, অতটা ভাল নয়।

বুনির জ্বলজ্বলে চোখদুটোয় হঠাৎ জল টল টল করতে থাকে। গলার স্বরটা একটু বদলে যায়। উদ্ধত শরীর সামান্য নুয়ে পড়ে। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, সবাই পিছুতে লেগেছে তা জানো ? ঘরে একটু শান্তি নেই। সবাই সারাক্ষণ বলছে মর মর। অথচ দোষ কী ? উল্টোডাঙার সেই পশ্চিমা বুড়োটাকে বিয়ে করতে মত দিচ্ছি না। কেন দেবো বলো তো ! আগের পক্ষের এই বড় বড় জোয়ান ছেলে আছে দুটো। আমার বাপ ভাই তো বোকা। বুড়ো তাদের বলেছে, বিয়ে করলে তার খাটাল গরু সব আমাকে দিয়ে দেবে। ওরা তাই বিশ্বাস করে। আমাকে দিন রাত বাড়ির লোক বোঝাচ্ছে, বুড়ো আর ক'দিন। হাঁপানি আছে, আরো কী কী আছে, বেশী নাকি বাঁচবে না। তখন বুড়োর সম্পত্তি হাতিয়ে আর একটা বিয়ে করলেই হবে। বলো তো বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে ?

দীর্ঘশ্বাসটা আপনিই বেরিয়ে গেল। আর তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল বুনির প্রতি আমার বিরাগ এবং ভয়। বুনির সঙ্গে আমার শ্রেণীগত পার্থক্য যে খুব বেশী নয় তা বেশ বুঝতে পারছি। একদিক দিয়ে বরং শ্রেণীগতভাবে বুনিকেই একটু উঁচু বলে ধরা যায়। বুড়ো বর বিয়ে করবে না বলে বুনি তো লড়ে যাচ্ছে। আমাদের লড়াই শেষ হয়ে গেছে কবে। দশ বছর আগে আমার ছোড়দি একটা বাচ্চা মেয়েকে পড়াতে যেত। তেমন বড়লোকের বাড়ি নয়, তবে লোকটার চালু একটা ব্যবসা ছিল। কাঁচা টাকা আসছিল হাতে। ছোড়দিকে তার একদিন হঠাৎ পছন্দ হয়ে গেল। ধানাই পানাই করে প্রেম নিবেদনের বয়স তখন নয় তার। তাই সে সোজাসুজি একদিন ছোড়দিকে বাস স্টপে এগিয়ে দিতে এসে প্রস্তাব দিল, ছোড়দি যদি রাজী থাকে তবে সে আলাদা বাসা করে নতুন সংসার পাতবে। তা বলে আগের বউকে ডিভোর্স করতে পারবে না বা ছোড়দিকে বিয়েও সে করবে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকবে। ছোড়দি কিন্তু কেঁদে-

কেটে একশা করেনি, রাগেনি, মুখের ওপর 'না'ও বলে দেয়নি। বরং বুদ্ধিমতীর মতো দুদিন চুপচাপ বসে প্রস্তাবটা নানা দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করেছে। নিজের যোগ্যতা এবং সৌন্দর্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। তার মনে হয়েছে, সে এমন কিছু আহামরি মেয়ে নয়। লোকটাকে প্রত্যাখ্যান করলে লাভ নেই। বরং সংসারটাকে বাঁচানোর জন্য একটু বয়স্ক এবং দুর্বল চরিত্রের একটু পয়সাওলা লোক তার পক্ষে ভালই হবে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে স্থির করার পর ছোড়দি মা বাবাকে জানায়। যথারীতি বাবা চেঁচামেচি শুরু করে, মা কাঁদতে থাকে। দিন সাতেক ধরে এরকম চলেছিল। তারপর বাবা চুপ মেরে গেল। মা ধাতস্থ হল। ছোড়দি একদিন একটু গম্ভীর এবং চিন্তিত মুখে চলে গেল লোকটার দ্বিতীয় সংসারে। প্রথম প্রথম বাবা ছোড়দির পাঠানো টাকা যাকে বলে "ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান" তাই করত। পরের দিকে অবশ্য ছোড়দির টাকায় আমাদের অনেক সুসার হয়েছিল। এমন কি আমরা তার বাড়িতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ খেতেও গেছি। লোকটাকে "জামাইবাবু" ডাকতেও আমাদের বাঁধেনি।

লোকটা কি খুব বুড়ো ? একেবারে থুত্থুরে ?

বুনি দুহাতে মুখটা ঢেকেছিল। এবার চোখ মুছে তাকিয়ে বলল, বুড়ো নয়তো কি ? তবে থুত্থুরে নয়। বেশ দশাসই ঘাড়ে গর্দানে আছে।

বয়স কত ?

চল্লিশের ওপর তো বটেই।

ধুস, চল্লিশ আবার বুড়ো কি রে ?

বুড়ো নয় তোমাকে বলেছে ! গোঁফ পেকেছে, চুল পেকেছে।

ধপধপে পাকা ? নাকি কাঁচায় পাকায় ?

বুনি হি হি করে হেসে ফেলে বলল, অত নিকেশ কেন নিচ্ছো বলো তো ! বল না।

কাঁচায় পাকায়। একেবারে গঙ্গা যমুনা।

বড় বড় ছেলে আছে বলছিলি যে !

বড়ই তো। বারো চোদ্দ বছরের তো হবেই।

আগের পক্ষের বউ বেঁচে আছে ?

না, মরে বেঁচেছে।

বিয়ের কথা কতদূর এগিয়েছে ?

কতদূর আবার কী ? পাকা কথা আদায় করে ছেড়েছে লোকটা। পরশুদিনই তো হল। আমার সঙ্গেই তো গিয়ে বাবার কাছ থেকে পাকা কথা আদায় করে

এল।

তোর সঙ্গে ? বলিস কী ?

আহা, নইলে গাঁয়ের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে কে ? স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকাইওনি। চলতে লাগলুম, পিছুপিছু চলে গেল।

সেইরকমই কথা ছিল নাকি ?

হুঁ।

লোকটা তোর সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করেনি ?

বুনি মাথা নেড়ে বলল, না। বেশ তফাতে ছিল। আমি শুধু পায়ের নাগড়া জুতোর আওয়াজ শুনছিলুম।

এই যে বললি হাঁপানি আছে। তবে তিন মাইল নাগড়া বাজিয়ে হাঁটল কী করে ? তাছাড়া হাঁপানি রুগীর কি দশাসই চেহারা হয় ?

তুমি বড় খিটকেলে লোক বাপু। হাঁপানি নেই তো অন্য কিছু আছে। বুড়োদের কি রোগের অভাব ?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, পাত্রটা খারাপ ছিল না রে। অত গিঁট মারলে পরে পস্তাবি। শেষে ঠেলাওলা, রিক্‌শাওয়ালা না হয় বেকার ছোঁড়া জুটবে কপালে।

বুনি ফোঁস করে উঠল, খবরদার ওরকম বলবে না বলছি। বামুনের মুখের কথা ভীষণ ফলে যায় তা জানো ? তোমারই বা বুড়োর জন্য অত দরদ চুঁইয়ে পড়ছে কেন ?

দরদ নয়। ভাবছিলাম গরুটরু পোষে, রোজ সরটর খাবি, রূপোর গয়না পরতে পাবি, পাঁচ বাড়ি কাজ করে বেড়াতে হবে না।

বুড়োর মুখে নুড়ো। গরুর দুধে আমার কাজ নেই।

এই বলে রাগ করে বুনি উঠে পড়ল। তার ঝাঁটার শব্দে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ পেতে লাগল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পাছে আমি মাগনা মাগনা টেলিফোন করে ডাক্তারের বিল বাড়িয়ে দিই সেই ভয়ে গদাই বোসের বউ টেলিফোনে তালা দিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না। একটা আলপিন দিয়েই তালা খুলে ফেলা যায়। আর আমার কাউকে তেমন টেলিফোন করার নেইও। শুধু পুপু। মাঝে মাঝে আমি পুপুকে টেলিফোন করি। পুপু আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। তবু আমি চেষ্টা করি। সামনে একটা টেলিফোন থাকলে কার না ইচ্ছে করে একটু কথা বলতে ? বিশেষ করে আমার মতো হাঘরেদের !

যখন পুপুরা গরিব ছিল তখন পুপু ছিল আমার দারুণ বন্ধু। এখন আর পুপুরা গরিব নয়। তাদের গ্যারেজে গাড়ি, বৈঠকখানায় কার্পেট। তাই পুপু এখন আমাকে এড়াতে চায়।

এই সময়টায় পুপু তাদের অফিসে থাকে। অফিস তাদের নিজেদের। পুপুরা ত্রিশজন কর্মচারিকে মাইনে দিয়ে রেখেছে। তার বাবার কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা বেশ ফলাও। আমি দেখেছি যেসব লোক মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং খানিকটা দূরদৃষ্টির অধিকারী তারা কাজে নেমে পড়লে টপ করে পয়সা করতে পারে। পুপুর বাবার এ দুটোই আছে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ পুপুর বাবা সেই ষাট পঁয়ষট্টি সালেই বুঝতে পেরেছিল যে কলকাতা শহরটায় অদূর ভবিষ্যতে বাস্তুজমির খুব চাহিদা দেখা দেবে। ধারকর্জ করে পুপুর বাবা ভবানীবাবু জমিজমা কিনতে লেগে যান। প্রথম প্রথম কেনা জমি বেশি দামে বেচার সহজ ব্যবসা ছিল তাঁর। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলেন জমি বেচা বোকামি। তার চেয়ে ফ্ল্যাট করে বেচলে লাভ বেশি। কিছু ফাঁকাপড়ার পর সেই ব্যবসাতে ভবানীবাবু লাল হয়ে গেলেন। কলকাতার ওনারশীপ ফ্ল্যাটের তিনিই বলতে গেলে অন্যতম পায়োনিয়ার। এখন কলকাতা এবং শহরতলি জুড়ে তাঁর হাতে গড়া অট্টালিকারা দাঁড়িয়ে মানুষের অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার জয়গান করছে।

হ্যালো, পুপু আছে ?

পুপু ? ওঃ হ্যাঁ। কে বলছেন ?

আমি ওর বন্ধু।

ধরুন একটু।

একটু নয়, অনেকক্ষণই ধরতে হল।

তারপর পুপুর বিরক্তিভরা গলা শোনা গেল, হ্যালো।

আমি কানু বলছি পুপু।

কানু ? কে কানু ?

আমার ডাকনামটা যদি পুপু ভুলে গিয়ে থাকে তবে খুবই মুশকিল। কারণ পুপু আমাকে আমার পোশাকী নামে তো চেনে না ! ভুলতে বেশি সময় নিচ্ছে না পুপু, সেটাও উদ্বেগের কারণ।

উদ্বেগের সঙ্গেই বললাম, আমি কানু ! কানু !

পুপু চিনল। কিন্তু গলার স্বরে বিরক্তিটা তবু গেল না। বলল, ওঃ, কানু ! কী ব্যাপার বল তো ?

পুপুকে আমি বরাবরই তুই-তোকারি করে এসেছি। কিন্তু আজ কিছুতেই তুই

পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

বলার সাহস হল না। বললাম, এমনিই ফোন করলাম। তুমি ভাল আছ তো পুপু ?

হ্যাঁ হ্যাঁ ভালই। তুই ভাল তো ?

না পুপু, আমি ভাল নেই। অনেকদিন আগে সেই ছেলেবেলায় তুমি আমাকে একটা কথা দিয়েছিলে পুপু। কথাটা কি মনে আছে ?

না, আমার কিছু মনে নেই। আজ ভীষণ ব্যস্ত রে কানু, ছাড়ছি।

ছাড়বে ? আচ্ছা।

বলে আমি ফোনটা কান থেকে সরাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পুপুর আর্ত চিৎকার শোনা গেল, কানু ! এই কানু ! ছেড়ে দিলি নাকি ! হ্যালো !

না, পুপু। ছাড়িনি। কী হল ?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল।

কী কথা পুপু ?

কে যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—সেদিন বলছিল তুই নাকি ইয়ে হয়েছিস।

কিয়ে হয়েছি পুপু ?

মানে ইয়ে, বেশ মারদাঙ্গাবাজ লোক ! কে বলছিল ঠিক মনে নেই। তবে তুই নাকি গদাই বোসের বডিগার্ড, সত্যি নাকি

আমি একটা ঢোক গিলে বলি, কেন বলো তো !

কেসটা কী একটু বলবি আমাকে ?

কেসটা যে কী তা আমিও ভাল জানি না। পুপুকে কীই বা বলব ? তবে আমার এরকম একটা কুখ্যাতি ইদানীং হয়েছে। কিন্তু হয়েছে সম্পূর্ণ কাকতালীয় যোগাযোগে। সেই যোগাযোগটা না হলে আজ গদাই বোসের বাড়িতে আমার এই অধিষ্ঠান বা তার ছেলে এবং মেয়েকে পড়ানোর দায়িত্ব পাওয়া সম্ভব হত না। হয়েছিল কি, ৮২ পল্লীর ট্যাপার দলে আমি কিছুদিন ভিড়ে গিয়েছিলাম। ট্যাপা তখনও মস্তানীতে তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। একটা সাট্টার বোর্ড চালাত, কিছু কিছু তোলাও নিত কয়েকজন দোকানদারের কাছ থেকে, আর সামান্য কিছু চুরি বা ছিনতাই। ট্যাপার দলে আমি ঢুকি ওই ছিনতাইয়ের সূত্র ধরেই। দুপুরবেলা ট্যাপা একটা মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ টেনে নিয়ে দৌড় মারে। মেয়েরা অবলা জীব বটে, কিন্তু এ মেয়েটা দারুণ দৌড়বাজ, তার ওপর ক্যারাটে-ফ্যারাটেও জানত বোধহয়। ট্যাপাকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে ঘাড়ে এমন রদ্দা মারল যে, ট্যাপা চোখ উল্টে গোঁ গোঁ করছিল। সেইদিনই ট্যাপার রুস্তম-জীবনের ওপর যবনিকা নেমে আসার কথা। দিনে-দুপুরে যে

মস্তান একটা মেয়ের হাতে মার খেয়ে জমি ধরে নেয় তার আর ভবিষ্যৎ কী ? আর একটু হলেই ট্যাপার সেই হেনস্তা দেখতে লোক জড়ো হয়ে যেত এবং ট্যাপার দলের ছেলেরাও তুরন্ত খবর পেত। তার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের বাড়ির সামনে। স্বচক্ষে পুরো ঘটনাটা আমি দেখেছি। ট্যাপার প্রতি অমার কোনো সহানুভূতি থাকার কথা নয়। শুধু মহিলা-প্রহৃত একজন পুরুষের প্রতি আর একজন পুরুষের যে সহানুভূতি থাকার কথা সেটুকু ছিল বলেই আমি কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সংজ্ঞাহীন ট্যাপাকে টেনে হিঁচড়ে ভিতরে এনে জলটল দিই।

সেই থেকে ট্যাপা আমাকে কিছু খাতির করতে থাকে। এমন কি আমাকে সে তাদের ক্যাশিয়ার অবধি করতে চেয়েছিল। ট্যাপাকে হাতে রাখার জন্যই আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, মেয়েটা আমার দূর সম্পর্কের মাসতুতো বোন হয়। হাওড়ায় থাকে, ইত্যাদি। যাই হোক, ট্যাপার সঙ্গে যখন আমার দোস্তি চলছে সেই সময় একদিন সন্ধেবেলা আমরা রাস্তার ধারে একটা ঠেক-এ দাঁড়িয়ে গুলতানি করছিলাম। সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে গেল হরিধ্বনি দিয়ে। দলের মধ্যে কে যেন বলল, নিমাইবাবুর বউ মরে গেল, জানিস। একদম তাজা বউটা। এসব কথা যখন হচ্ছে এবং মড়া নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা রাস্তা দিয়ে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন চিৎকার করতে করতে, ওগো, তোমরা মড়া আটকাও ! মড়া আটকাও ! ওকে খুন করেছে ! ভদ্রমহিলার আঁচল লম্বা হয়ে লুটোচ্ছে রাস্তায়, মাথার চুল এলোমেলো, চোখে পাগলের মতো চাউনি। পিছনে এক বুড়ো মতো ভদ্রলোকও খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর কাঁদতে কাঁদতে আসছিলেন। গণ্ডগোলের গন্ধ পেয়েই আমাদের মধ্যে কয়েকজন ছুটল মড়া আটকাতে।

মড়া ফেরানো হল। থানা-পুলিশ করা হল। বিশাল গণ্ডগোল। দেখা গেল নিমাইবাবুর বউয়ের ডেথ সার্টিফিকেট সই করেছে গদাই ডাক্তার। ট্যাপার নেতৃত্বে আমরা গিয়ে যখন গদাই ডাক্তারের বাড়ি চড়াও হই তখন নিচের তলার চেম্বারে অনেক রুগী। লোকজন গিসগিস করছে। বাইরে গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে মেলা। তখনও আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না কী করা উচিত। প্রথমেই অ্যাক্শন নেওয়া নাকি আগে গদাই ডাক্তারের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া ? ট্যাপার ইচ্ছে প্রথমেই অ্যাকশনে নেমে পড়া। তার কারণ মস্তান হতে গেলে ছোটোখাটো ব্যাপার দিয়ে হয় না। কলকাতার যেসব মস্তান বড় হয়েছে তারা সকলেই লাইম লাইটে এসেছে একটা কোনো বড় রকমের কিছু ঘটিয়ে বা ঘটনার

সূত্রে। ট্যাপা আজ অবধি তেমন কোনো বড় ঘটনা ঘটায়নি। এটা এক মোক্ষম সুযোগ। নিমাইবাবু তার বউকে খুন করিয়ে, গদাই ডাক্তারের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড় করে কেস ফিনিস করে দিয়েছিল প্রায়। এরকম রগরগে কেস বরাতে কমই জোটে। থানা পুলিশ আদালত এবং খবরের কাগজে এ নিয়ে প্রবল হৈ চৈ হবেই আর ট্যাপা এই সুযোগে একেবারে ফোরফ্রন্টে এসে যাবে। আর এর জন্য চাই অ্যাকশন, কুইক অ্যাকশন। উত্তেজনায় সে তখন ফুলছে, ফুঁসছে।

পরিস্থিতিটা বুঝেও আমি মিনমিন করে বললাম, দ্যাখ ট্যাপা, প্রথমেই যদি ইঁটপাটকেল মারিস, ঢিল ছুঁড়িস বা গালাগাল দিতে শুরু করিস তাহলে একটা কেলো হয়ে যেতে পারে। গদাই বোস বড় ডাক্তার, এফ আর সি এস। ওর রুগীদের মধ্যে মেলা ভি আই পি।

কিন্তু ট্যাপা তখন ফাটা বিষ্টু হওয়ার স্বপ্নে মাতাল। অমিতাভ বচ্চনের মতো একটা হাসি দিয়ে বোধহয় কোনো হিন্দি সিনেমারই ডায়লগ ধার করে বলল, আ বে কেন্নো (আমার নির্বীর্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওরা সকলেই আমাকে কানুর বদলে কেন্নো বলে ডাকত), সরাফৎ ভি কোই চীজ হ্যায়। গদাই বোস ইনসান নেহি, জানবর! জানবর! অ্যায়সা কিচাইন করব আজ যে কাল সকালে দেখিস স্টেটসম্যানে ভি আমার নাম বেরিয়ে যাবে।

আমরা তখনো অ্যাকশন শুরু করিনি, তবে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে এবং জমায়েত দেখে প্রথমে জিম চেঁচাতে শুরু করে, তারপর পাড়ার লোক উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ট্যাপা আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঠিক হ্যায় দোস্ত, তুই আগে গিয়ে গদাই বোসকে একটা আল্টিমেটাম দে। বলিস পেট থেকে আসলী বাৎ না বেরোলে লাশ ফেলে দিয়ে যাবো।

কেসটা কী তা ভাল করে না জেনেই লাশ ফেলে দেওয়াটা যে উচিত হবে না তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বোঝাই কাকে? ট্যাপা বিনি মদেই সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে তার চেলা চামুণ্ডাদের বেশ জোর গলায় বলছে, এবার শালা কেস আমার হাতে। নেবু, কালোমাণিক, শ্যামল বনিক এরা সব ফোলম ফোল হয়ে যাবে দেখে নিস।

বলা বাহুল্য নেবু, কালোমানিক আর শ্যামল বণিক হল আশপাশের পাড়ার উঠতি মস্তান।

আমি গিয়ে যখন ডাক্তারের বাড়ি ঢুকলাম তখন বৈঠকখানায় রুগীরা সব বাইরের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ছিল। আমাকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল

অনেকে, স্পষ্ট দেখলাম।

পাশেই ডাক্তারের চেম্বার। দোর বন্ধ। জয় দুর্গা, বলে ঠেলে ঢুকে গেলাম ভিতরে। চেম্বারের ভিতরে একদিকে ডাক্তারের চেয়ার টেবিল, অন্যধারে টানা পর্দার পিছনে রুগী দেখার জায়গা। সেখান থেকেই গদাই ডাক্তারের গলার স্বর আসছিল, কী, লাগছে? অ্যাঁ! লাগছে? এবার এখানটায় ফিল করুন তো! ব্যথা টের পাচ্ছেন? হাঁটুদুটো ভাঁজ করুন...

বুঝতে পারলাম, গদাই বোস এখনো বাইরের গণ্ডগোল টের পায়নি। আমি পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি, গদাই বোস এক বুড়ো মানুষের পেট টিপে টিপে পরীক্ষা করছে।

ডাক্তারবাবু!

কে? অ্যাঁ! কী ব্যাপার? ঢুকে পড়েছেন যে বড়। যান, যান বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি আপনার রুগী নই।

গদাই বোস প্রচণ্ড বিরক্ত মুখে বলল, তাহলে আপনি কে? কী চান?

এ প্রশ্নের জবাবে আমার বলা উচিত ছিল যে, আমি ট্যাপা নামক একজন অখ্যাত মস্তানের দলের লোক এবং তার মুখপাত্র। কিন্তু বাস্তবিক ট্যাপার মতো একজন নিম-মস্তানের সাকরেদী করতে আমার একটু ঘেন্নাও ছিল। তাই এই সুযোগে ট্যাপার বদলে আমি নিজেই একটু লাইম লাইটে আসার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমি কানু লাহিড়ি। এ পাড়ায় আমাকে সবাই চেনে।

আমি তো চিনি না।

আমার একটা দল আছে। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। খুব ভাল ছেলে নয়।

এত কথা বলছেন কেন? কী ঘটনাটা বলুন। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত দেখতেই পাচ্ছেন।

নিমাইবাবুর বউ মার্ডার হয়েছে আপনি জানেন?

নিমাইবাবু? বিরাশি পল্লীর?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আপনিই তার ডেথ সার্টিফিকেট সই করেছেন।

আলবাৎ করেছি। মার্ডার কে বলল?

এখন সবাই বলছে। পাড়া গরম। ডেডবডি আমরা আটকেছি। পুলিশ ডেডবডি পোস্ট মর্টেম করতে নিয়ে গেছে।

এ কথায় বুড়ো রুগীটি তড়াক করে উঠে বসে কোমরের কষি বাঁধতে লাগল। ডাক্তারের ফর্সা মুখ হয়ে গেল টকটকে লাল। চাপা গলায় ডাক্তার তার রুগীকে

বলল, বাজে কথা ! একদম বাজে কথা ! আপনি বিশ্বাস করবেন না। শুয়ে থাকুন, আমি দু মিনিট বাদে আপনাকে দেখছি। আগে একে ছেড়ে দিয়ে আসি। (তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে) আসুন তো আপনি, এদিকটায় আসুন। বলুন তো কী ব্যাপার ! নিমাইবাবুর বউ মার্ডার হয়েছে বলে কোনো মেডিক্যাল ম্যান কি আপনাদের জানিয়েছে ?

না, তবে আমরা জানি।

ডাক্তার তার চেয়ারে বসতে বসতে বলল, কী করে জানলেন ? এসব তো কোনো মেডিক্যালম্যান ছাড়া কারো পক্ষে ডিকটেট করা সম্ভব নয়।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, আমরা জানি।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল, কিছুই জানেন না। ভদ্রমহিলা অনেক দিনের হার্ট পেশেন্ট। সুনীল সেনের কাছে আমিই ওকে রেকমেণ্ড করে পাঠাই। উনি কিছুদিন ওঁর ট্রিটমেন্টে ছিলেনও। তারপর বাঙালী হাউজ ওয়াইফদের যা স্বভাব, ওষুধ খেতেন না, ঠেসে দোক্তা খেতেন পানের সঙ্গে। ফ্যাট, ঝাল মশলা, লঙ্কা সবই চলছিল। কাল রাতে হার্ট অ্যাটাক হতেই আমাকে কল দেওয়া হয়। বাট শী ওয়াজ বিয়ণ্ড স্যালভেজ। কিছু করার ছিল না। মার্ডারের প্রশ্ন ওঠে কিসে ?

কোনোরকম বিষ বা কিছু ?

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে, অসম্ভব।

পোস্ট মর্টেমে যদি অন্য কিছু বেরোয় ?

বেরোতেই পারে না। আমি ধান চাল দিয়ে ডাক্তারী শিখিনি।

ডাক্তারের বুড়ো রুগীটি পা টিপে টিপে সুরুৎ করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরের রুগীর সংখ্যাও দ্রুত কমে যাচ্ছে, হুড়োহুড়ি এবং পায়ের শব্দে তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি। গজাং করে একটা ইঁট এসে কোনো একটা জানালার গ্রীলে লাগল।

ডাক্তার উদ্বিগ্ন মুখে উঠতে উঠতে বলল, ওরা কী করছে ?

আমি অভয়ের ভঙ্গীতে হাত তুলে একটা ভয় খাওয়ানো কথা বললাম, এখন বাইরে যাবেন না। ওরা ডেঞ্জারাস বয়েজ।

ডাক্তারের মুখটা আরো লাল হয়ে উঠল। বলল, আপনি কী ভাবছেন বলুন তো আমাকে ! মেডিক্যাল কলেজে, প্রেসিডেন্সীতে আমি অনেক ছাত্র আন্দোলন করেছি। একসময়ে অ্যাকশন স্কোয়াডেও ছিলাম। আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন ?

"অ্যাকশন স্কোয়াডে ছিলাম" বলতে ডাক্তার কী বোঝাতে চাইল তা আর

আমি জানার চেষ্টা করিনি। সব দলেরই একটা করে অ্যাকশন স্কোয়াড থাকে। তবে আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললাম, ইউ আর আউট অফ প্র্যাকটিস। তাছাড়া সেই দিনও তো আর নেই। একসময়ে সোডার বোতল বা ইঁট ছুঁড়লেই যথেষ্ট অ্যাকশন হত। আজকাল মিনিমাম অ্যাকশন হল মার্ডার।

ডাক্তার ধপ করে ফের বসে পড়ল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল, এসবের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র আছে। আপনাদের প্ল্যানটা কী বলুন তো ? কিছু একটা রটিয়ে আমার প্র্যাকটিস নষ্ট করে দিতে চান ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, একজন ভাল ডাক্তারের কাছে অবশ্য সেটা মৃত্যুর চেয়েও বড় পানিশমেন্ট। তবে প্ল্যানটা আমাদের নয়। এ পাড়ায় বাস করি, সুতরাং পাড়ার ভালমন্দ আমাদের একটু দেখতে হয়।

খচাং খচাং করে আরও গোটাকয়েক ইঁট এসে পড়ল। একটা শার্শি ভাঙল বৈঠকখানায়। ট্যাপার তর সইছে না।

ডাক্তার আবার উঠবার উপক্রম করে বলে, এসব কী হচ্ছে বলুন তো ! আপনার দলের ছেলেরা ইঁট মারছে কেন ?

আমি হাত তুলে বললাম, বাইরে যাবেন না। আপনার ভালর জন্যই বলছি।

কিন্তু ওরা ইঁট মারছে কেন ? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। দেশটা কি পুরোপুরি অ্যান্টিসোশ্যালদের হাতে চলে গেল ? দাঁড়ান, আমি থানায় ফোন করছি।

ডাক্তার ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, পুলিশ আপনাকে হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রোটেকশন দিতে পারবে তো !

তার মানে ?

আপনাকে কল-এ বেরোতে হয়, পাড়ায় বেপাড়ায় যেতে হয়, তখন তো পুলিশ সঙ্গে থাকবে না। একটু ভেবে দেখুন। তাছাড়া পুলিশকে ডাকতেও হবে না, তারা নিজের গরজেই আসবে। আপনি তো অ্যাকসেসরি টু মার্ডার।

ইটস্ আ ড্যাম লাই।

বাইরে থেকে ট্যাপার বিকট গলা শোনা গেল হঠাৎ, আব্বে শুয়োরের বাচ্চা কানু, বেরিয়ে আয়। কী হচ্ছে কি ভিতরে শুনি।

কয়েকটা কাঁচা খিস্তিও কানে এল। অপমান বোধ করার কিছু নেই। এসব আমাদের কমন ডায়ালগ।

ডাক্তারের মুখটা অত্যধিক লাল। আমার মনে হচ্ছিল ওরই এখন চিকিৎসা দরকার। ডাক্তার দাঁত কড়মড় করে বলল, যদি মার্ডারই হয় তাহলেও যা করার

পুলিশ করবে। আপনারা কেন? কী চান আপনারা?

কী চাই তা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার বুঝবেও না। আমরা চাই গদাই বোসকে ফাঁসিয়ে ট্যাপা জাতে উঠে যাক। কিন্তু আমার কেন যেন বাতাস শুঁকে মনে হচ্ছিল ট্যাপা কোনোদিনই জাতে উঠবে না। মস্তান হওয়ার জন্য কিছু ঠাণ্ডা মাথা এবং দূরদৃষ্টি দরকার। ট্যাপার তা নেই। তাছাড়া কেসটা সত্যিকারের মার্ডার কিনা সে বিষয়ে আমার হঠাৎ সন্দেহ হতে শুরু করেছে। আরো গোটাকয়েক শার্শি প্রায় একসঙ্গে খন্‌খন্ করে ভাঙল। ওপরতলায় জিম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলার উপক্রম।

আমি বেগতিক দেখে উঠলাম। বললাম, ঠিক আছে, আমি ওদের সামলে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ঘটনাটা এখানেই শেষ হবে না। আপনারা ভি আই পি লোক, সত্যিকারের মার্ডার হয়ে থাকলেও টাকাপয়সা প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে খালাস পেয়ে যাবেন। অজকাল বেশির ভাগ কেস-ই তাই। কিন্তু খালাস পেলেও আমরা ছাড়ব না। মনে রাখবেন।

আমি সদর দরজায় পা রেখেই দেখি খুনির চেহারা নিয়ে ট্যাপা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বিঘৎ দেড়েক ছুরি, চোখ ঘোলাটে, কষে ফেনা। তার পিছনে বিশু, হাবু, কেলো, চিতে এবং আরো অনেকে। সবাই টং। ট্যাপা আমার জামাটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, খুনীটার সঙ্গে কিসের ঘষাঘষি হচ্ছিল? কোথায় শালা? আজই গজা ভরে দিয়ে যাব।

ট্যাপাকে আমি ভয় পেতে ভুলেই গেছি। আজও পেলাম না। শুধু ঠাণ্ডা গলায় বললাম, গদাই বোসকে খুন করলে তোকে পুলিশ কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

মওত সে কৌন ডরতা হ্যায় বে? রাস্তা ছাড়।

ট্যাপা যখন আমাকে সরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল তখন আমি খুব আলতো করে বললাম, ট্যাপা, তোর কিছু হবে না। তোর কূটনৈতিক বুদ্ধি নেই।

কী নেই বললি শালা?

তোর আক্কেলও নেই। নইলে যখন নেগোসিয়েশন চলছে তখন দুমদাম ইঁট মেরে, খিস্তি দিয়ে, ঝামেলা মাচিয়ে কেসটা কেলো করে দিতিস না।

ট্যাপা আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, শালা একটা জলজ্যান্ত মার্ডার হয়ে গেল পাড়ায়, আর তুই জ্ঞান দিচ্ছিস!

মার্ডার বলে এখনো প্রমাণ হয়নি।

ডালমে কুছ কালা হ্যায়?

হ্যায় তো জরুর। এখন ফোট।

কভি নেহি। আমি ওকে গুলি করে মারব। এ পাড়া আমার।

তোর রিভলভার আছে?

ছোরা আছে।

ছোরা দিয়ে গুলি করা যায় না। বেশি তড়পাবি তো চিমনিকে নিয়ে এসে মুখোমুখি ফেলে দেবো। এখনো কেউ জানে না ট্যাপা, কিন্তু আমার সঙ্গে বেশি গড়বড় করলে জেনে যাবে।

বলা বাহুল্য যে মেয়েটার হাতে ট্যাপা মার খেয়েছিল এবং যাকে আমি মাসতুতো বোন বলে চালিয়ে দিয়েছি তার একটা কাল্পনিক নামও দিতে হয়েছে। সেই নাম চিমনি। নামটা শুনে ট্যাপার হাত পা শিথিল হয়ে গেল। চোখের চাউনিটায় দেখা দিল বিহ্বলতা আর ভয়।

মৃদুস্বরে ট্যাপা ডাকল, দোস্ত।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কিচাইন করিস না। ফিরে যা।

ট্যাপা ফিরে গেল। দৃশ্যটা চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল গদাই বোস। ভিতরের দিকের দরজায় গদাই বোসের ছেলেমেয়ে এবং বউও অপলক চোখে দেখছিল। নিজেকে তখন একটু হীরো-হীরো লাগছিল আমার। আমি গদাই বোসের দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বললাম, কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, ওরা আনকালচার্ড।

গদাই বোস গম্ভীর গলায় বলল, তাই দেখছি।

দু-তিন দিনের মধ্যেই নিমাইবাবুর বউয়ের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বেরোল। কোনো অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়নি। হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বাবার একটা ছোট্ট স্ট্রোক মতো হয়। গদাই বোসের মত বড় ডাক্তারকে দেখানোর কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমরা দেখাই পাড়ার গোপাল ডাক্তারকে, তাও তেমন বিপদে পড়লে। গোপাল ডাক্তারের ভিজিট চারটাকা, তাও আবার বাকি রাখা যায়। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল, গদাই বোসকে কল দিলে ভিজিট নেবে না। নিলে অবশ্য বিপদ। কারণ গদাই বোসের ভিজিট চৌষট্টি টাকা। তবু আমি একটা রিস্ক নিলাম।

গদাই বোস এল। রুগী দেখল। প্রেসক্রিপশন লিখল। তারপর বেরোবার মুখে আমি সঙ্গ ধরে পকেটে হাত দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললাম, আপনার ভিজিটটা...

গদাই বোস হাত তুলে বলল, থাক থাক। লাগবে না। আপনার সঙ্গে আর একটা কাজের কথা আছে। আমার গাড়িতে উঠুন। যেতে যেতে বলছি।

গাড়িতে উঠে গদাই বোস বলল, আপনাকে দেখে তো অশিক্ষিত বা আনকালচার্ড মনে হয় না। পড়াশুনো কতদূর ?

আজ্ঞে বি এস-সি, অঙ্কে অনার্স ছিল।

সে কী ? তার মানে আপনি তো রীতিমতো··· তা ওদের সব জোটালেন কী করে ?

খুব উদাসীন ভাব করে বললাম, এমনিতেই সব গাড্ডায় চলে যাচ্ছে দেখে আমি একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি আর কি।

দেখলাম, আপনাকে বেশ মানে।

তা মানে।

দেখুন কিছু মনে করবেন না, এ পাড়ায় আমি অনেকটা কী বলে—একজন ফরেনারের মতো আছি। কারো সঙ্গে তেমন চেনাজানা, আলাপ-সালাপ নেই। ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর। লক্ষ করছি এখানে অনেকেই আমাকে তেমন যেন পছন্দ করে না।

আজ্ঞে সেটা স্বাভাবিক। চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তারের সঙ্গে এই গরিব পাড়ার লোকদের সহজ সম্পর্ক কি হয় ? তাছাড়া আপনার বাড়ি, গাড়ি, কুকুর, বিলিতি ডিগ্রি এসবও আমাদের কাছে অস্বস্তির কারণ।

তা বটে, তা বটে। বাঃ, আপনি বেশ কথা বলেন তো ! ইউ আর রিয়েলি কালচার্ড। তা আমি ভাবছিলাম, এ পাড়ার লোকদের সঙ্গে একটু পাবলিক রিলেশনস করলে মন্দ হয় না। ইন ফ্যাকট করা দরকারও। আমার স্ত্রী অবশ্য অন্য কথা বলেন।

কী বলেন তিনি ?

তিনি এ বাড়ি বেচে দিয়ে আর একটু সম্ভ্রান্ত পাড়ায় চলে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু সেটা হুট করে তো সম্ভব নয়। তিনতলা এত বড় বাড়ি কে কিনবে ? আমার নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি। খরচও অনেক হয়েছে। ছয় লাখ। তাই আমি ভাবছিলাম বাড়িটা বেচে দেওয়ার বদলে মানুষের কো-অপারেশন গ্যাদার করাটাই বোধহয় বেটার হবে। কী বলেন ?

নিশ্চয়ই।

এ ব্যাপারে আপনি যদি একটু হেল্প করতে পারেন তো ভাল হয়। পাড়ার মাতব্বরদের আমি চিনি। তারা আমাকে পছন্দ না করলেও দায়ে দফায় আসে। কিন্তু লোকগুলো মতলববাজ। আমি চাই আপনাদের মতো এনারজেটিক ইয়ংম্যানদের কো-অপারেশন।

আমি রাজী।

ওঃ হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনি তো অঙ্কে অনার্স ! তা আমার মেয়েটা এবার মাধ্যমিক দেবে। অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। টিউটর আছে, কিন্তু প্র্যাকটিসটাই করে না। শী নিডস্ এ গাইড। আপনি পড়াবেন ?

আমি এক কথায় রাজী হয়ে যাই।

গদাই বোসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সেই শুরু।

এই ঘটনা থেকে কেউ যদি ডাক্তার গদাই বোস ওরফে গদাধর বোসকে বোকা বলে মনে করেন তাহলে ভুল করবেন। আপাতদৃষ্টিতে পাড়ার এক অজ্ঞাতকুলশীল ছোকরাকে নিজের উঠতি বয়সের মেয়ের টিউটর নিয়োগ করা চরম অবিমৃষ্যকারিতা। টিউটর-ছাত্রীর প্রেম প্রায় প্রথাসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কার্যত ডাক্তার গদাই বোস মোটেই অদূরদর্শী নয়। তার মেয়েটি—অর্থাৎ মিলি—একটি জাঁহাবাজ। ক্লাস ফাইভের পর থেকে সে প্রতি ক্লাসেই একবার দুবার ঠেকে ঠেকে উঠেছে। ফলে কচি খুকি নয়। উপরন্তু অল্প বয়স থেকেই বিস্তর ছেলেকে চরিয়ে সে এত বড়টি হল। আমার মতো নভিসের দিক থেকে তার কোনো বিপদের সম্ভাবনাই ছিল না। উপরন্তু গদাই আমাকে টিউটর রেখেছিল মুঠোয় আনার জন্য। তার প্ল্যান ছিল সম্পূর্ণ অন্য। চৌমাথার কাছে, বাজারের মোড়ে একটা ফলাও জমির মস্ত প্লট কিনে নার্সিং হোম শুরু করেছিল সে। কিন্তু নার্সিং হোম খুলবার আগেই পাড়ার ছেলেরা এসে বাগড়া দিল। তাদের দাবি, পাড়ার অন্তত চারটি মেয়ে এবং দশটি ছেলেকে চাকরি দিতে হবে। নইলে নার্সিং হোম খুলতে দেওয়া হবে না। গদাই বোসের মাথায় হাত।

টিউশনি শুরু করার কয়েকদিন বাদেই গদাই বোস আমাকে একদিন নিভৃতে ডেকে সব খুলে বলল। তারপর বলল, আপনাকে আমার একটা উপকার করতেই হবে। ওদের বুঝিয়ে বলুন যে, নার্সিং হোম-এ নন-স্পেসিফিক জব-এর স্কোপ সামান্যই। ওরা যে চারটি মেয়েকে গছাতে চাইছে তার মধ্যে একজন মাত্র নার্সিং জানে। ছেলেগুলোরও কোনো স্পেসিফিক ট্রেনিং নেই।

যদি বুঝতে না চায় ?

একটু ফোর্স দিয়ে বোঝাতে পারবেন না ?

আমি বুঝলাম। ডাক্তার আমাকে একটু মস্তানী প্রয়োগ করার ইঙ্গিত করছে।

আমি বললাম, পারব। তবে···

তবের কথা বলতে হবে না। আমি পে করব।

কাজটা শক্ত ছিল না। ট্যাপা তখনো একটা বড় কিছু ঘটাবার জন্য

তড়পাচ্ছে। তার ভীষণ দুঃখ, এখন অবধি সে একটাও লাশ ফেলেনি। বড় কোনো ঘটনা ঘটায়নি। তাই তাকে টোপটা দিলাম এবং কেসটা সিওর করার জন্য চিমনির কথাটা তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হল।

বলা বাহুল্য গদাই ডাক্তারের নার্সিং হোম খুলতে আর কোনো বেগ পেতে হয়নি।

বুঝতে পারছি আমার গুডউইল বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। নইলে পুপুর কানে অবধি কথাটা গিয়ে পৌঁছত না। আমি ফোনটা কানে একটু নিবিড় করে চেপে ধরে মোলায়েম গলায় বললাম, ও কিছু নয় পুপু, মাঝে মাঝে পাড়াটা একটু শাসন করতে হয়। তুমি তো একসময় এ পাড়ায় ছিলে। জানোই তো কিরকম পাড়া।

তা জানি। এখন বোধহয় আরো ডেটোরিয়েট করেছে।

করেছে পুপু।

কিন্তু তোকে যে আমার দরকার।

কেন দরকার পুপু?

আমরা একটা প্রবলেমে পড়েছি। তুই হয়তো সলভ্ করতে পারবি।

প্রবলেমটা কী?

খুব সেনসিটিভ প্রবলেম। সেন্ট্রাল রোডে আমরা একটা হাইরাইজ পশ অ্যাপার্টমেন্ট এস্টেট করার প্ল্যান করেছি। সুইমিং পুল, পার্ক, ছোট্টো একটা অডিটোরিয়াম, শপিং সেন্টার সবই থাকবে। সরকারি ভেস্ট ল্যাণ্ড। একটা রিজনেবল দামে জমিটা আমরা কিনেছিও। কিছু জবরদখল ছিল। টাকাপয়সা দিয়ে তুলে দিয়েছি। পাড়ার ক্লাব, পুজো কমিটিকেও ম্যানেজ করা গেছে। মুশকিল হয়েছে একটা বুড়ো লোককে নিয়ে। সে উঠতে চাইছে না।

কী বলছে সে?

খুব ওল্ড ফ্যাশনড কথাবার্তা বলছে। সে প্রথমেই আমাদের অফার রিফিউজ করে। সে বলেছে, বাঙালীদের আপনারা কলকাতা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাইছেন। কলকাতাটা আবাঙালী বড়লোকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এইসব আলতু ফালতু কথা।

কথাটা কি খুব মিথ্যে পুপু?

ডোণ্ট বি সিলি কানু। বিজনেস ইজ বিজনেস। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট শুধু মাড়োয়ারি আর গুজরাটিই তো বুক করেনি, বহু বাঙালীও করেছে।

কিরকম বাঙালী? বড়লোক?

অবশ্যই। বড়লোক ছাড়া ওই অ্যাপার্টমেন্ট কে নেবে? মিনিমাম দামের ফ্ল্যাটই পাঁচ লাখ। অল মডার্ন ফিটিংস, অল মোজেইক, অল ডিসটেম্পারড।

বড়লোকরা বাঙালী হয় না।

তার মানে?

বলছিলাম বাঙালীরা যখন বড়লোক হয় তখন আর বাঙালী থাকে না। কেমন যেন সাহেব-সাহেব ফরেনার-ফরেনার হয়ে যায়।

কী বলছিস রে হাবিজাবি? কোথায় হেলপ করবি, না প্রথম থেকেই উল্টোপাল্টা বকছিস।

ওই একটা লোক থাকে থাক না।

দূর বোকা, তাই কি হয়? ওরকম পশ একটা হাউসিং এস্টেটের মধ্যে টিনের চাল আর বেড়ার ঘর থাকবে? কিরকম দেখাবে সেটা?

তাই তো!

তাছাড়া লোকটা বসে আছে একেবারে মাঝখানটায়। ওকে না তুলতে পারলে কনস্ট্রাকশন শুরু করাই যাবে না।

কত টাকা অফার করেছিলে লোকটাকে?

অনেক। অন্যেরা যা পেয়েছে তার ডবল। কিন্তু লোকটা টাকার কথা কানেই তুলছে না। বলছে, জানি আপনাদের অনেক টাকা আছে। কিন্তু আমাকে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না।

এরকম লোক এখনো আছে নাকি?

আসলে নেই। লোকটা স্রেফ আমাদের সঙ্গে মামদোবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো আরো কিছু খসানোর মতলব। কিন্তু সেটাও তো বলবে! কিছুই বলতে চাইছে না। আজকাল আমাদের লোক গেলে দেখা অবধি করে না।

কিন্তু জমিটা তো তোমরা কিনেছো পুপু! ওকে মামলা করে তুলে দাও।

না রে, অত সহজ নয়। জমিটা সরকারি হলেও শুধু ওই লোকটার জমিটা গোলমেলে। ওটা সরকারি জমি নয়। তা সেরকম প্লট অবশ্য আরো কয়েকটা ছিল, কিন্তু সবাই দাম পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই লোকটাই···

লোকটা কিরকম একটা ডেসক্রিপশন দেবে? মানে কী কাজ করে, পলিটিক্যাল কানেকশন আছে কিনা, মস্তান হাতে আছে কিনা···

আরে না। প্রাইমারি স্কুলের টিচার। পলিটিক্যাল কোনো কানেকশন নেই। তবে একটা ব্যাপার হল, লোকটাকে পাড়ার লোক খুব মানে। নাম বললে তুই হয়তো চিনতেও পারিস।

কে বলো তো !

সতীশ ঘোষ ।

নামটা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম । অনেকদিন আগেকার একটা ছোট্টো দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল । ক্লাসের বাইরে কান ধরে নীলডাউন হয়ে আছি । ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল । স্কুলের বাড়িটা ছিল ভাঙাচোরা । টিনের চালে মেলা ফুটো । বারান্দার চাল থেকে দেদার জল পড়ছিল গায়ে । কিছু করার ছিল না । হঠাৎ সতীশবাবু ছাতা হাতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন । হারামজাদা, ভিজতে খুব ভাল লাগে, না ? বলে ছাতাটা মেলে ধরলেন মাথার ওপর । যতক্ষণ ক্লাস চলল ততক্ষণ আমার মাথায় ছাতা ধরে রেখে বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে ক্লাসের ছেলেদের ডিকটেশান দিয়ে যাচ্ছিলেন । ইচ্ছে করলেই শাস্তি মকুব করে ক্লাসঘরে ফিরে যেতে বলতে পারতেন আমাকে । বলেননি । ইচ্ছে করলে ক্লাসঘরে নীলডাউন করতে পারতেন, করেননি । যা স্বাভাবিক, যা প্রথাসিদ্ধ, তা করলে সতীশবাবু আর সতীশবাবু কিসের ? ছাত্রকে ক্লাসের বাইরে নীলডাউন হওয়ার আদেশ একবার তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে । সুতরাং তার আর নড়চড় হওয়ার উপায় নেই । তাই ঘণ্টা বাজা অবধি মাথায় ছাতা ধরে রইলেন, কারণ তাঁর কাছে সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল ।

কী রে, চিনতে পারলি ?

আমি একটু ভাবলাম । চিনি বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না । তাই বললাম, না, চিনি না । কিন্তু আমাকে কী করতে হবে বলো তো !

লোকটাকে তুলতে হবে ।

যদি না ওঠে ?

আরে এমনিতে উঠছে না বলেই তো তোর হেল্প চাইছি । যেমন করেই হোক তুলতে হবে । আমাদের প্রজেক্টটা যেমনই বিগ তেমনই প্রেস্টিজিয়াস । একজন সেন্টিমেন্টাল বুড়োর জন্য এতবড় প্রজেক্টটা তো বন্ধ থাকতে পারে না । কী বলিস ?

ঠিকই তো ।

তোর এলাকা তো সেন্ট্রাল রোড থেকে খুব দূরে নয় । পারবি না এই উপকারটা করতে ?

চেষ্টা করতে পারি ।

আমরা টাকা খরচ করতে রাজী ।

টাকা ! টাকা দিয়ে কি একাজ হবে !

কী দিয়ে হবে সেইটাই তো বুঝতে পারছি না । যে যেমন মানুষই হোক না কেন তার একটা কোনো উইকনেস থাকবেই । এই লোকটাকে আমরা নানারকম লোভ দেখিয়েছি । কাজ হয়নি ।

তুমি আমাকে কী করতে বলো পুপু ? লোকটাকে আরো লোভ দেখাবো ? নাকি ভয় দেখাবো ?

এনিথিং । যে ভাবেই হোক আমরা লোকটাকে ওঠাতে চাই ।

ভয় বা লোভে যদি কাজ না হয় পুপু ?

কাজ হওয়ানোর ভার তোমার ওপর ।

যদি আমি ফেল করি ?

ফেল করবি কেন ? লোকটা তো আর অমর নয় ।

তার মানে কী পুপু ? দরকার হলে মার্ডার··· ?

চুপ ! এসব কথা ফোনে নয় ।

ঠিক আছে পুপু, আমি বুঝে নিয়েছি ।

তোকে খুশি করে দেবো কানু । চিন্তা করিস না । এই প্রজেক্টটার ওপর আমাদের কোম্পানির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে । যদি কমপ্লেকসটা আমরা করে উঠতে পারি তাহলে বিগার কনস্ট্রাকশনে যাওয়ার সুবিধে হয়ে যাবে ।

বুঝেছি পুপু ।

একদিন চলে আয় না, গল্প করা যাবে ।

যাবো পুপু । যেতে তো হবেই ।

তাহলে তোর ওপর নির্ভর করতে পারি তো !

দেখি পুপু, চেষ্টা করব ।

যখন ফোন ছাড়লাম তখন আমার অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে । এই শীতেও ।

॥ দুই ॥

জীবনের সব ঘটনারই একটা শুরু থাকে । এবং সেই শুরুটার জন্যই যত কিছু নাভাসনেস । যেমন জীবনের প্রথম চুমু, প্রথম সহবাস, প্রথম ইনজেকশন, প্রথম অপারেশন বা প্রথম খুন । শুরুটা হয়ে গেলে তারপর সবই আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যায় ।

তবে বলতেই হবে জীবনের প্রথম ইনজেকশনটা আমি খুব খারাপ দিলাম না । একজন বুড়োমতন লোক দুপুরবেলা এসে হাজির । হাতে একটা ইনজেকশনের অ্যামপুল । বলল, আপনিই কি কম্পাউণ্ডারবাবু ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কেউ নই।

ডাক্তার! ও বাবা, গদাই ডাক্তার মস্ত ডাক্তার। আমি গরিব মানুষ, চারু ডাক্তারকে দেখাই। চারটাকা ভিজিট। ওই মোড়ের ওষুধের দোকানের কম্পাউণ্ডারবাবুটির বাবা মরেছে বলে দেশে যেতে হল। ধারে কাছে আর কেউ নেই যে একটু ওষুধটা ভরে দেয় শরীরে। তা মনে হল এতবড় ডাক্তারের বাড়িতে নিশ্চয়ই কাউকে পাবো। দেবেন নাকি দিয়ে ইনজেকশনটা?

লোকটা বুরবক, গেঁয়ো, গরিব। একটু জরিপ করে নিলাম। না, তেমন ঝুট ঝামেলার লোক নয়। দুটো টাকা মুফৎ আসছে, ছাড়ি কেন?

দরজাটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললাম, আসুন।

ইনজেকশন দেওয়া এবং নেওয়া আমি বিস্তর দেখেছি। কাজটা তেমন শক্ত নয়। প্রথমে সিরিঞ্জটা একটু ধুয়ে স্পিরিটে মুছে সামান্য শুকিয়ে নিয়ে অ্যাম্পুল ভেঙে ওষুধটা টেনে নেওয়া। এই অবধি জলবৎ। শুধু শরীরে ছুঁচ ঢোকানোর সময়টায় যা গোলমাল। কিন্তু দুটো টাকা ঘরে বসে রোজগার করতে গেলে ওটুকু রিস্ক নিতেই হয়।

লোকটাকে বসিয়ে আমি চেম্বার খুললাম। কাজটা বলতে যত সোজা কার্যত তত নয়। চেম্বারে তালা দেওয়া এবং এ তালাটা বেশ একটু ভাল জাতের। একটা জেমস ক্লিপ দিয়ে বিস্তর কসরৎ করে সেটা খুলতে হয়।

তিন চার রকমের সিরিঞ্জ থেকে আমি একটা মাঝারি সিরিঞ্জ বেছে নিলাম এবং খুব দ্রুত ডাক্তারের চেয়ারের গদিতে কয়েকবার ফুটিয়ে একটু প্র্যাকটিসও করে নেওয়া গেল। তারপর তৈরি হয়ে নিয়ে লোকটাকে ডাকলাম, আসুন।

লোকটা দিব্যি এসে বসল এবং চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বলল, চারু ডাক্তারটা একেবারে যাচ্ছেতাই। এত সুন্দর চেম্বার জন্মেও হবে না। কম্পাউণ্ডারবাবু, গদাই ডাক্তার মেলা পাশ—না?

হ্যাঁ। ইনজেকশন নিতে আপনি ভয়টয় পান না তো?

আরে না, রোজ নিতে হচ্ছে। তা ডাক্তারবাবুর ভিজিট কত?

অনেক। চেম্বারে বত্রিশ, বাড়িতে নিলে চৌষট্টি।

ও বাবা! তাই বলি, চারু ডাক্তারের কিছু হবে না। চার টাকা ভিজিটে কি কিছু হয়! দিন ফুঁড়ে দিন।

আপনার ছুঁচে লাগে না তো।

তা লাগত আগে। একসময়ে তো কেঁদেকেটে একশা করতাম। আজকাল টেরই পাই না। দিয়ে দিন, কিছু ভয় নেই আপনার। ওব্যেস, সবই ওব্যেস।

তা বটে। তবু লোকটার বাঁ হাতের চামড়ায় যখন স্পিরিট ঘষছি তখন আমার অল্প অল্প ঘাম হতে লাগল। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে হাত।

অ্যাম্পুলটা ভেঙে ওষুধ টেনে নিলাম। কী ওষুধ তা জানি না। যদি পুশ করার পর মরে-টরে যায়?

আপনার হার্ট ভাল তো?

কে জানে! চলে তো টিকটিক করে শুনি।

প্রেসার-টেশার?

আজ্ঞে তাও থাকতে পারে। চারু কি আর ঠিকমতো কিছু দেখে? বুকে নল ঠেকিয়ে চোখ বুজে নিদান লিখে দেয়। ফোরটুয়েন্টি। ভিজিট যার চার সে কি ডাক্তার?

এই ইঞ্জেকশনটা নিচ্ছেন কেন? অসুখটা কী?

মাজায় ব্যথা কম্পাউণ্ডারবাবু, দারুণ ব্যথা। উঠতে বসতে প্রাণান্ত।

বয়স কত?

তাই বা কে হিসেব রেখেছে? তবে সত্তর পার করেছি মনে হয়। তা কম্পাউণ্ডারবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কী?

এই আগে ডাক্তাররা যে সব মিকশ্চার-টিকশ্চার দিত সেগুলো আর দেয় না আজকাল?

ওসব সেকেলে ব্যাপার।

তাই বলুন! আগে দেখতাম বুড়ো কম্পাউণ্ডার সাতটা বোতল থেকে লাল নীল হলুদ সবুজ কতরকম ওষুধ শিশিতে মেশাচ্ছে, প্রকাণ্ড খলনুড়িতে বড়ি ঘষে গুঁড়ো করছে। ভারি ভক্তি হত, দেখে। তারপর কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে আঠা লাগিয়ে শিশিতে সাঁটারই বা কত বাহার ছিল। হয়ে গেছে নাকি কম্পাউণ্ডারবাবু?

না, এখনো ছুঁচ ঢোকাইনি। চোখ বন্ধ করে শক্ত হয়ে বসুন।

তাই নিয়ম নাকি? কই, ওই কম্পাউণ্ডারবাবুটি তো সেকথা বলেনি আমাকে! হাতুড়ে, বুঝলেন, আজকাল সব হাতুড়ে। তা শক্ত হয়ে এই বসলাম। এবার দিন শালাকে ঠেলে!

রুগীর চেয়ে আমি অনেক বেশি সিঁটিয়ে শক্ত হয়ে গেছি। মনে মনে নানা বীরত্বের ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করছি। কিছুই মনে আসছে না।

হয়ে গেল নাকি কম্পাউণ্ডারবাবু? বাঃ, আপনার হাত তো দিব্যি। টেরই

পেলাম না। তাই বলি, এত বড় ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার হওয়াই কি খুব সোজা নাকি? যে সে কি হতে পারে?

হয়নি। আপনি অত বকবক করবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন।

আজ্ঞে আমি ঠাণ্ডাই আছি। গোলমালটা কি হচ্ছে বলুন তো!

খানিকটা ধৈর্যহীন হয়েই আমি লোকটার হাতখানা চেপে ধরে প্যাঁট করে ছুঁচটা ফুটিয়ে দিলাম। লোকটা একটু কেঁপে উঠে চুপ করে গেল।

ওষুধটা যথাসাধ্য আস্তে আস্তেই ঠেলে দিলাম আমি। তারপর এক ঝটকায় ছুঁচটা টেনে নিতেই কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামল ক্ষতস্থান দিয়ে। তুলোটা চেপে ধরে বললাম, লেগেছে?

লোকটা কেমন কেৎরে বসে আছে। চোখ বোজা। জবাব দিল না।

ও মশাই!

উঁ!

বলি লেগেছে?

লোকটা একটু হেসে মাথা নাড়ল, তা একটু। তবু বলি বেশ ভালই দেন আপনি। চমৎকার। অনেকদিন বাদে ইঞ্জেকশন কাকে বলে তা যেন টের পেলাম। নিতে নিতে হাতদুটো অসাড় হয়ে গিয়েছিল তো। টেরই পেতাম না।

লোকটা দুটো টাকা টেবিলে রেখে বলল, আবার কাল আসব কিন্তু।

আমি আতঙ্কিত গলায় বলি, আবার?

হেমেন কম্পাউণ্ডারের বাপের শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত।

টাকা দুটোর দিকে চেয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে।

লোকটা বিদেয় হলে যখন টাকাদুটো তুলে পকেটে রাখতে যাচ্ছি তখন দোতলা থেকে ঘ্রাউ ঘ্রাউ করে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল জিম। দেখলাম, দুটো হাতই বেজায় কাঁপছে। ভয় ভয় করছে ভিতরটা। যাকে বলা যায় ডিলেইড রি-অ্যাকশন। এই অবস্থায় আমাকে কেউ দেখে ফেললে সমূহ বিপদ।

আমার কপালে বরাবরই দেখেছি খোঁড়া পা-খানাই খাদে পড়ে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। যখন কম্পিত হাতে নিজের দুষ্কর্মের চিহ্ন মুছতে সিরিঞ্জটা ধুচ্ছি ঠিক সেই সময়ে চেম্বারের দরজা থেকে একটি জোরালো মেয়েলী কণ্ঠ বলে উঠল, আরে!

এমন চমকে উঠলাম যে হাত থেকে সিরিঞ্জটা খসে পড়ে খানখান হয়ে ভাঙল।

চমকানোরই কথা। দরজায় একটি লাউডগা সাপ ফণা তুলে দুলছে। এত

সবুজ আমি আর কাউকে বড় একটা দেখিনি। টিপ, নখ, ঘড়ির ব্যাণ্ড থেকে কানের দুল অবধি সবুজ। ঠোঁটে সবুজ লিপস্টিক, পরনে সিল্কের সবুজ চুড়িদার, সবুজ ওড়না, পায়ে সবুজ চপ্পল। চোখমুখ ফুটফুটে এবং ধারালো। শরীরটা ছোটোখাটো এবং হিলহিলে। একটু নজর করে দেখলে সাপের সঙ্গে অনেকগুলো পয়েন্টে মিল আছে।

খুব কুটিল চোখে আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি বলল, আপনি খুব চমকে গেছেন! কী করছিলেন বলুন তো!

আমি কী করছিলাম তা জানার অধিকার মেয়েটার আছে কিনা তা আমি জানতে চাইলাম না। বরং আমতা আমতা করে বললাম, আমি! আমি খুব সিরিয়াস একটা কাজ করছিলাম। এভাবে মানুষকে চমকে না দিয়ে বাইরের কলিং বেলটা বাজালেই তো পারতেন! জানান দিয়ে এলে সিরিঞ্জটা ভাঙত না।

আই অ্যাম সরি। কলিং বেলটা বাজাতেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বুড়ো মতো একটা লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আমাকে বলল, যান, ভিতরে যান। কম্পাউণ্ডারবাবু চেম্বারেই আছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, বুঝেছি।

মেয়েটা স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল, আপনি কি মিলির বাবার কম্পাউণ্ডার?

ওই একরকম।

মেয়েটা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, মিলির বাবার কোনো কম্পাউণ্ডার আছে বলে তো আমি জানি না।

মেয়েটার এই অনভিপ্রেত কৌতূহলে বিরক্ত হয়ে বললাম, এবার তো জানলেন।

মেয়েটা তবু ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, না। মিলিদের কোনো কম্পাউণ্ডার নেই। এবার বলুন আপনি সিরিঞ্জ দিয়ে কী করছিলেন। নিশ্চয়ই কোনো ড্রাগ?

ড্রাগ?

হেরোইন না অন্য কিছু?

আমি একটু নিবে গেলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, আপনি আমাকে আবার চমকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু!

মোটেই নয়। আমি ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি। মিলিদের কোনো কম্পাউণ্ডার নেই এবং আপনিও কম্পাউণ্ডার নন। সম্ভবত আপনি ওদের সেই

টিউটর। তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে সিরিঞ্জ দিয়ে আপনি কী করছিলেন?

মেয়েটা বেশ রোখা-চোখা টাইপের। একা বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের মুখোমুখি পড়ে কোথায় একটু গুটিয়ে যাবে, তা না উল্টে তড়পাচ্ছে এবং বেশ ঠাণ্ডা হিসেবী উকীলী গলায়। মডর্ন জেনারেশনের এসব মেয়েদের ভয়ডর লজ্জা-সঙ্কোচ কম। তাই আমি খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে অগ্রাহ্যির ভাবটা ঝেড়ে ফেলে কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, ড্রাগ-ফ্রাগ আমি জানি না। লোকটা বিপদে পড়ে এসেছিল, বলল মাজায় লাম্বাগো না কী যেন। ইঞ্জেকশন দেওয়ার লোক পাচ্ছে না। তাই ....

এই কি আপনার প্রথম ইঞ্জেকশন? নাকি আগে দিয়েছেন?

মাইরি না। আজই বউনী হল।

সর্বনাশ!

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কাজটা তেমন শক্ত কিছু তো নয়। তাছাড়া লোকের উপকার ....

মেয়েটা সবুজ বালা পরা একটা হাত বাড়িয়ে বলল, অ্যামপুলটা দেখি। কী ইঞ্জেকশন দিলেন একটু জানা দরকার।

আমি অ্যামপুলটা টেবিল থেকে তুলে মেয়েটার হাতে দিয়ে ঈষৎ কম্পিত গলায় বললাম, বিষ-ফিস হলে আমি কিন্তু জানি না। আমার কোনো দোষ নেই। লোকটাই ওষুধটা নিয়ে এসেছিল।

মেয়েটা অ্যামপুল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, লোকটার কথাতেই আপনি এত বড় একটা রিস্ক নিলেন?

আমি একটা ঢোঁক গিলে বললাম, রিস্ক কিছু ছিল না। একদম সোজা ব্যাপার। কম্পাউণ্ডাররা ইঞ্জেকশন দিয়ে যে দুটো করে টাকা নেয়, একদম ফালতু। একটু নার্ভ থাকলে যে-কেউ পারে। এমন কি আপনিও পারবেন।

আমি তো পারবই, কারণ আমার ট্রেনিং আছে।

তার মানে?

আমি মেডিক্যাল থার্ড ইয়ারের ছাত্রী।

ও বাবা!

মেয়েটা অনেকক্ষণ বাদে এই প্রথম একটু হাসল। ক্ষীণ সবুজ একটু হাসি। বলল, আপনার নার্ভ খুব স্ট্রং। তাই না?

আজ্ঞে সবাই তাই বলে।

কথাটা কমপ্লিমেণ্ট হিসেবে নেবেন না।

তাহলে?

ওর আরও একটা মানে থাকতে পারে তো! যেমন ধরুন গুণ্ডা মস্তানদেরও নার্ভ খুব স্ট্রং হয়।

আমি গুণ্ডা মস্তান নই।

ডিফেনসিভ হওয়ার দরকার নেই। গুণ্ডা মস্তানদের আমি তেমন অপছন্দ করি না। যদি অবশ্য তারা একটু এডুকেটেড, কালচার্ড আর পলিশড হয় এবং মীন, চীপ আর ইতর না হয়। আপনি ভাঙা কাচগুলো তুলে ফেলুন। তারপর আপনার সঙ্গে কথা আছে।

আমি তৎক্ষণাৎ চটি দিয়ে ঘষটে ঘষটে বাধ্য ছেলের মতো কাচগুলো জড়ো করতে করতে আবহাওয়াটা হালকা করার জন্য বলি, কিছু লোক মানুষকে বোকা পেয়ে দু'হাতে পয়সা লুটছে। তাই না?

তাই নাকি? কিরকম?

এই তো ইঞ্জেকশনের কথাই ধরুন। লোকে খামোকা ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের কাছে ছোটে। অথচ ....

আপনি খুব বকছেন। ইঞ্জেকশন দেওয়া একটা হাইলি রেস্ট্রিকটেড ব্যাপার। মোটেই সহজ কাজ নয়। আপনি যা করেছেন তা ক্রিমিন্যাল অফেন্স। বুড়ো লোকটা স্ট্রোক হয়ে মরে যেতে পারত।

কিন্তু মরেনি তো! বরং উল্টে আমার প্রশংসা করে গেছে।

মেয়েটা তীক্ষ্ণ নজরে আমাকে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর অ্যামপুলটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, এটা কী ধরনের ইঞ্জেকশন তা কি আপনি জানেন?

মাথা নেড়ে বলি, না।

এটা তো ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশনও হতে পারত!

তাই তো! আমি বুরবকের মতো অ্যামপুলটার দিকে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটা ধীর গলায় বলল, এমন অনেক ইঞ্জেকশন আছে যা বহুক্ষণ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে দিতে হয়। তাড়াহুড়ো করলে রুগী হার্টফেল করতে পারে। তাছাড়া বাবলস চলে যেতে পারে শিরায়, আরো কত কী হতে পারে। পারে না?

আমি ভীত মুখে বললাম, পারে। এটাও কি সেরকম?

মেয়েটা আবার সবুজ একটু হেসে বলল, না। আপনার কপাল ভাল যে এটা

সেরকম কোনো ওষুধ নয়।

হাঁফ ছেড়ে বললাম, বাঁচালেন।

কিন্তু আবার বলি আপনার নার্ভ খুব স্ট্রং। এবং আপনি খুব খারাপ লোক।

অনেকে তাই ভাবে। কিন্তু ....

মিলি আমাকে সবই বলেছে। আপনি যে ভীষণ খারাপ ধরনের লোক তা নিজের চোখেও দেখলাম। ওই বুড়ো লোকটার কাছ থেকে আপনি কত টাকা নিয়েছেন?

মাত্র দুই। চাইনি, মাইরি বিশ্বাস করুন। নিজে থেকে দিল। এই যে....

মেয়েটা এবারও সবুজ করে হাসল। বলল, যাক, দেখাতে হবে না। আপনি বসুন।

আমার বসাটা খুব দরকার হয়ে পড়ছিল। ডাক্তারের রিভলভিং চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম। মুখোমুখি মেয়েটা। সবুজ রং করা চোখে একটা সাপিনীর মতো নিষ্ঠুরতায় আমাকে লক্ষ করছে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। মেয়েটার মুখে একটা হাসির ভান আছে। কিন্তু আসলে হাসছে না। মেয়েটা কে বা কোত্থেকে এল তা জিজ্ঞেস করার সাহসটুকু পর্যন্ত বোধ করছি না। এবার মেয়েটা কী বলবে তা আন্দাজ করতে না পেরে আমি ঘামতে থাকি।

কিন্তু মেয়েটা এমন একটা প্রশ্ন করল যার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। মেয়েটা বলল, আমার বই তিনটের কী হবে বলুন তো!

আমি খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললাম, বই! বই! আপনি কি বইয়ের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। আমার তিনটে বই মিলির কাছে ছিল। মিলি ইজ ভেরী ইররেসপনসিবল।

বই! কিসের বই?

একটা হেলি, একটা লুডলাম...

আমি স্মৃতির চাবুকে সোজা হয়ে বসে বলি, আপনি যাজ্ঞসেনী আয়ার!

হ্যাঁ। সেদিন ফোনে....

আমি অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থেকে বললাম, কিন্তু সেদিন ফোনে কথা বলে আপনাকে আমার সম্পূর্ণ অন্য রকম মনে হয়েছিল।

কি রকম?

আমতা আমতা করে বলি, এই ইয়ে.... অনেক লাইট হার্টেড, ফূর্তিবাজ, অনেক হাসিখুশি। আপনি আমার সঙ্গে ইয়ার্কিও মারছিলেন।

যাজ্ঞসেনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আজ আর আমি সেই যাজ্ঞসেনী নই। আই হ্যাভ চেঞ্জড এ লট। তিনটে বই আমার জীবনটাকেই পাল্টে দিয়ে গেছে।

সে কী! যতদূর মনে পড়ে আমি আপনাকে বই তিনটে কিনে দিতে বলেছিলাম!

যাজ্ঞসেনী মাথা নেড়ে বলে, আপনার সাজেশনে কোনো কাজ হয়নি। বই তিনটে আমি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। মাসীর জা অ্যাকসেপ্ট করেননি।

কেন?

কারণ আছে। সেন্টিমেন্টাল কারণ। বই তিনটে ওকে প্রেজেন্ট করেছিল ওর এক কাজিন। তার সাইন করা বই। বেচারা ক্যানসারে সম্প্রতি মারা গেছে। ফলে বই তিনটের সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু এখন স্কাই হাই। ইন ফ্যাকট নতুন বই নিয়ে যাওয়ায় উনি ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েন। আমাকে ইনসাল্টও করেছেন। বলেছেন আমি নাকি লাইট-হেডেড, ইররেসপনসিবল, ভয়েড অফ ভ্যালুজ।

কিন্তু মিলি ফিরে এলেই তো ....

যাজ্ঞসেনী মাথা নাড়ল, না, উনি সময় দিতেও রাজী নন। এক্ষুণি বইগুলো ফেরৎ চান। কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না।

কিন্তু কেন?

সেটাই তো মিস্ট্রি। হয়তো আসলে বই তিনটে উনি ফেরৎ চাইছেনও না। কিন্তু ওই অজুহাতে আমার মাসীকে নানারকমে জব্দ করছেন। মাসী এত আপসেট যে রোজ সকালে আমাদের বাড়ি এসে আমাকে যাচ্ছেতাই করে বকছে। রত্না মাসী ভীষণ ভালবাসত আমায়। তুমি থেকে কখনো তুই বলেনি, বকা তো দূরের কথা।

এ যে দেখছি ঘ্যাম কেলো।

তার মানে?

আমি মাথা চুলকে বলি, ঠিক বোঝানো যাবে না।

সেই সব স্ল্যাংগুলোর একটা নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যাজ্ঞসেনী বুঝল। বলল, হ্যাঁ, ঘ্যাম কেলো। মাসীকে এরকম বিপদে ফেলেছি বলে আমার মাও আমার ওপর ভীষণ চটে আছে। কথাই বলছে না, বললেও একাক্ষরী।

তার মানে?

একাক্ষরী মানে একটা দুটো শব্দ। যেমন ধরুন হ্যাঁ, না, ওঃ, হুঁ।

বুঝেছি।

শুধু তাই নয়। আজ মাসী এসে বকুনি দিচ্ছিল বলে আমার বাবা আমাকে একটু ডিফেণ্ড করতে চেয়েছিল। তাইতে মা বাবার ওপর রেগে গিয়ে এমন অপমান করল যে বাবা স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে দিল্লি চলে গেল।

একেবারে দিল্লি?

বাবার দিল্লি যাওয়ার কথাই ছিল। হয়তো সামনের রবিবার যেত। কিন্তু এই ঘটনার ফলে আজই চলে গেল। শুধু তাই নয়, আমার মা আর বাবার মধ্যে বিয়ের পর এই প্রথম ঝগড়া। পঁচিশ বছর বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া না হওয়া একটা বিশ্ব-রেকর্ড। সেই রেকর্ড আজ ভেঙে গেল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, স্যাড! ভেরি স্যাড।

এখন বুঝতে পারছেন তো যাজ্ঞসেনী কেন আর আগের যাজ্ঞসেনী নেই?

পারছি।

একেই কি বলে ঘ্যাম কেলো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লাইফ যখন একদম কেরাসিন হয়ে যায় তখনই বলা যায় ঘ্যাম কেলো।

কেরাসিন? সেটা আবার কী?

মানে লাইফটা যখন হেল হয়ে দাঁড়ায় তখনই বলা যায় কেরাসিন।

যাজ্ঞসেনী উদাসভাবে খানিকক্ষণ আমার পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে বলল, একদম কেরাসিন। খেতে পারছি না, ঘুমোতে পারছি না, ঘুমোলেও দুঃস্বপ্ন দেখছি, লোকের সঙ্গে অকারণে খারাপ ব্যবহার করে যাচ্ছি, জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে, পড়াশুনো হচ্ছে না, মাঝে মাঝে সুইসাইড করার কথা ভাবছি। কেরাসিন ছাড়া একে আর কী বলা যায়?

খুব পেরাসনী যাচ্ছে আপনার, কিন্তু কী আর করা?

পেরাসনী! আপনার ভোকাবুলারি তো খুব স্ট্রং! এটার মানে কী?

হয়রানি আর কি!

যাজ্ঞসেনী আবার সবুজ একটু হাসল। তারপর নিজের সবুজ বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়ে বলল, জানি পাওয়া যাবে না তবু বই তিনটে আমাকে একবার খুঁজে দেখতে হবে। একটু হেলপ করবেন?

আমি তড়াক করে উঠে পড়ে বললাম, নিশ্চয়ই। চলুন।

যাজ্ঞসেনী ধীরে ধীরে উঠল। বলল, আপনার খুব পেরাসনী হবে না তো!

আরে না না। কী যে বলেন!

দুঃখ যে মানুষকে কতটা সুন্দর করে তোলে তা যাজ্ঞসেনীকে দেখলেই বোঝা যায়। এমনিতেই যাজ্ঞসেনী যাকে বলে ফুটফুটে। কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী মাত্রা যোগ হয়েছে ওর গম্ভীর, বিষণ্ণ, দুঃখী মুখখানারগভীরতায়। উদাস চোখে চারদিক দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে আমার পিছু নিয়ে ওপরে উঠে এল। শরীরে কোথাও কোনো চঞ্চলতা নেই। ভারী ধীর স্থির আত্মমগ্ন এক বয়স্কা মহিলা যেন।

মিলির ঘরের দরজায় তালা দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি ভরসা দিয়ে বললাম, খুলে দিচ্ছি। নো প্রবলেম।

জেম্‌স্ ক্লিপ দিয়ে তালা খোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিস্তর প্র্যাকটিস দরকার। গত পনেরো-ষোল দিন নিরন্তর প্র্যাকটিসে অবশ্য আমার হাত পাকা হয়ে গেছে। তালা খুলতে ঘড়ি ধরে আমার মাত্র ছ' সেকেণ্ড লাগল।

বিস্মিত যাজ্ঞসেনী ভ্রূ তুলে বলল, এটা কী হল? চাবি কি হারিয়ে গেছে?

না তো! চাবি ওরা আমাকে দিয়ে যায়নি।

কেন? মিলিরা কি আপনাকে বিশ্বাস করে না?

না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাজ্ঞসেনী বলল, আপনাকে অবশ্য বিশ্বাস করাও চলে না। ইউ আর ভেরি আনপ্রেডিকটেবল। চোরটোর নন তো! যেভাবে তালাটা খুললেন....

আমি মাথা চুলকে বললাম, গরীবের তেমন কোনো চরিত্র থাকে না। অবস্থা এবং পরিস্থিতির চাপে কখনো সাধু, কখনো চোর। গরীবকে ক্যাটেগোরাইজ করা মুশকিল।

যাজ্ঞসেনী মুখখানা আস্তে ঘুরিয়ে নিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বড়লোকেরাও তাই। কিন্তু এভাবে মিলির ঘরে ঢোকা কি ঠিক হবে? ট্রেসপাসিং হয়ে যাবে না তো!

তা হবে। ধরা পড়লে নিশ্চয়ই ট্রেসপাসিং, না পড়লে নয়।

মিলির ঘরে একটা সবুজ উদ্ভাস ঘটিয়ে যাজ্ঞসেনী ঢুকল এবং কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সারা ঘরটাই লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে মিলি। বিছানায় পড়ে আছে ছেড়ে-যাওয়া নাইটি, গাউন, শাড়ি। ড্রেসিং টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে মেক-আপের শিশি, ঢাকনা খোলা পাউডারের কৌটো। একটা ঝুটো গয়নার বাক্স মেঝের ওপর রাখা। বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল সব কিছুই

অগোছালো।

যাজ্ঞসেনী এই তুমুল বিশৃঙ্খলার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নাকটা কুঁচকে বলল, এ ঘরটা এরকম অগোছালো করল কে ?

মিলিই। ও একটু অগোছালো।

যাজ্ঞসেনী আমার দিকে ফের অপলক চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি নন তো !

আমি ! আমি কেন করব ?

হয়তো কিছু খুঁজেছিলেন।

না, মাইরি না।

আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।

যাজ্ঞসেনী তার অপলক চোখে আমাকে বিদ্ধ করে রাখে কিছুক্ষণ। বলতে দ্বিধা নেই যাজ্ঞসেনী চোখের নানা ব্যবহার ও কূটকৌশল জানে। এ বাড়িতে পা দিয়ে অবধি সে আমাকে চোখের অনেক প্রক্রিয়া দেখিয়েছে। আমার ওপর তার প্রতিক্রিয়াও বড় কম হয়নি। এবারেও হল। আমি ধীরে ধীরে নতমস্তক হয়ে বলি, খুঁজিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। খুঁজেছিলাম।

কী খুঁজেছিলেন ?

বিশেষ কোনো জিনিস নয়। শুধু খুঁজে খুঁজে দেখছিলাম মিলির কী কী আছে যা আমার বোনের নেই !

কী দেখলেন ?

দেখলাম মিলির অনেক কিছু আছে।

আপনার বোনের সেগুলো নেই ?

না।

যাজ্ঞসেনী উদাস গলায় বলল, আমারও এমন অনেক কিছু আছে যা মিলির নেই। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

কী প্রমাণ হয় না ?

প্রমাণ হয় না যে আমি মিলির চেয়ে বেশী সুখী বা আপনার বোন মিলির চেয়ে দুঃখী। আমাদের তো টাকার অভাব নেই। প্রচুর টাকা। তবু বলুন আমার রত্না মাসীর জায়ের কাজিনের সই করা তিনটে বই কি এনে দিতে পারব এখন ? অথচ সস্তা, ফুটপাথে পাওয়া যায় এমন সব বই। যার অভাবে আমার জীবনটা.... কী যেন.... ?

কেরাসিন।

কেরাসিন হয়ে গেল। ঘ্যাম কেলো। তাই না কথাটা ?

তাই। আপনার পিক আপ খুবই ভাল।

যাজ্ঞসেনী চকোলেট রঙের একটা নাইটি ঘেন্নার সঙ্গে সরিয়ে দিয়ে বিছানার এক ধারে বসল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনারা কি খুবই গরীব ?

খুব। তবে আমাদের চেয়েও গরীব আছে।

কিন্তু আপনি গরীবই বা কেন ? গুণ্ডা মস্তানদের তো এখন বাজার খুব হট। আমি শুনেছি আমার বাবা দুজন মস্তানকে মাসে দু হাজার টাকা করে স্যালারি দেয়।

আমি ঢোঁক গিললাম। বললাম, তা বটে। তবে আমার ক্যারিয়ারটা এখনো যাকে বলে ঠিক তৈরি হয়ে ওঠেনি।

মিলি তো বলে যে আপনি একটা বিরাট দলের সর্দার।

বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ও তেমন কিছু নয়।

আপনার চেহারা আর হাবভাব অবশ্য মস্তানদের মতো নয়।

প্রসন্ন হয়ে বলি, সবাই তাই বলে।

আপনার চেহারায় একটা শিফটিনেস আছে। সোজা তাকাতে পারেন না, সব সময়ে একটু অস্বস্তিতে থাকেন, অনেকটা চোর-চোর ভাব। তাই না ?

এটা কি কমপ্লিমেন্ট ?

মাথা নেড়ে যাজ্ঞসেনী বলল, তা অবশ্য নয়। তবে আপনার নার্ভ আছে।

আমি বিনীতভাবে মাথা নত করলাম।

যাজ্ঞসেনী বলল, মিলির বাবা আপনাকে কত দেয় ?

বেশী নয়। একটা বাচ্চা ছেলেকে তো পড়াই। সত্তর টাকা।

যাজ্ঞসেনী সীমাহীন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সত্তর ! মাত্র সত্তর !

সত্তর টাকাও অনেকের কাছে অনেক টাকা।

তাহলে আপনি খুব পেটি মস্তান।

আমি মাথা নেড়ে বলি, আমি সত্তর টাকা পাই মিলির ভাইকে পড়ানোর দরুন। মস্তান বলে নয়।

কিন্তু আমাদের কোনো টিউটরই যে চারশো টাকার নিচে পায় না।

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে, মিলিরা গরীব।

যাজ্ঞসেনী মাথা নেড়ে বলল, শুধু গরীব নয়, কৃপণ, ভীষণ কৃপণ।

অনেকটা তাই।

যাজ্ঞসেনী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, তবু আপনি এদের আঁকড়ে পড়ে

আছেন ! কেন বলুন তো ! কিসের আশায় ?

আমার যে যাওয়ার আর জায়গা নেই।

কে বলল নেই ? পৃথিবীটা অনেক বড় জায়গা। মিলিদের বাড়িতে আটকে থাকলে তো সেটা বোঝা যাবে না ! একটা মার্ডারের চার্জ কত আপনি জানেন ?

চমকে উঠে বলি, না !

খুব কম করে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। আর তেমন উঁচু দরের লোক হলে তাকে মার্ডার করার রেট টুয়েন্টি থার্টি থাউজ্যাণ্ড হতে পারে।

জিবটা শুকিয়ে আসছিল। ক্ষীণ স্বরে বললাম, তাই' নাকি ?

আপনি ক'টা করেছেন ?

আমি ! মানে.... এখনো....

বিস্মিত যাজ্ঞসেনী ঝুঁকে পড়ে বলে, করেননি ! একটাও না ?

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলি, না। তবে করে ফেলব যাজ্ঞসেনী।

যাজ্ঞসেনীর চোখমুখ ধক ধক করছিল। কিছুক্ষণ আমার দিকে ঘেন্নার চোখে তাকিয়ে তীব্র চাপা স্বরে বলল, সত্তর টাকার মস্তান। হুঁঃ !

আত্মগ্লানিতে আমার চোখে প্রায় জল এসে যাচ্ছিল। আমি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাজ্ঞসেনী আমাকে উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে ঘুরে তার তিনটে বইয়ের নিষ্ফলা অন্বেষণ শুরু করল। আমার দিকে ফিরেও চাইল না। আমি বেকুবের মতো, গাড়লের মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাজ্ঞসেনী বুক-কেসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল কিছুক্ষণ। টেবিলের ওপর বইগুলো আলগা হাতে নাড়ল চাড়ল। গুনগুন করে একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল। ড্রয়ার খুলল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ড্রয়ারের ভিতরে। তারপর একগোছা চিঠি বের করে আনল।

কিছু পেলেন ?

এগুলো কি আপনার লেখা ?

চিঠিগুলো আমি চিনি। সাদা কম দামী খাম। একটা লাল রিবন দিয়ে বাঁধা।

আজ্ঞে হ্যাঁ !

যাজ্ঞসেনী একটা চিঠি বের করল। পড়ল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার লজ্জা করে না ?

এখন করছে। মাইরি !

এসব কী লিখেছেন ? বিশ্বাস করো মিলি, তোমার আমার সম্পর্ক এক জন্মের নয়। তারপরই কোটেশন "অনাদিকালের স্রোতে ভাসা মোরা দু'টি প্রাণ ...."। ছিঃ !

যাজ্ঞসেনী যেন একটা রোঁয়া-ওঠা ঘেয়ো ঘিনঘিনে নোংরা বেড়ালছানাকে দেখছে, এমনভাবে চেয়ে রইল। আমি এক পা পিছিয়ে দাঁড়াই।

যাজ্ঞসেনী মাথা নেড়ে বলল, আজকাল এ ধরনের লাভ-লেটার কেউ লেখে ? এখনকার লাভ-লেটার অনেক প্রিসাইজ, টু দি পয়েন্ট, অ্যানইমোশ্যন্যাল। এ তো সেই মান্ধাতার আমলের ল্যাংগোয়েজ ! ....এই যে আর একটা ! লিখেছেন, ...আমি মরে যাবো মিলি, মরে যাবো ! তোমার সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে দেবো নিজের বুকে। বিষ খাবো। আগুন লাগাবো কেরোসিন ঢেলে.... ছিঃ ! এসব কী শুনি !

আমতা আমতা করে বলি, লাভ-লেটারে সত্যি কথা বড় একটা লেখা হয় না।

কিন্তু নিশ্চয়ই একটা ফিলিং ছিল ! মিলির জন্য কোনো পুরুষ মানুষ মরার কথা ভাবতে পারে এটাই কল্পনা করা যায় না।

আজকাল আমিও আর ওরকম ফিল করি না।

তার মানে কোনোদিন করতেন ?

না, ঠিক তাও নয়।

আমি ভাবছি মিলি আপনাকে হিপনোটাইজ করল কী করে। ওর কী আছে বলুন তো !

ইয়ে মানে আপনাকে সেদিন টেলিফোনেও বলেছিলাম যে, ওইসব প্রেমপত্র আসলে আমি মিলিকে লিখিনি। লিখেছি ওর বাবাকে.... মানে বড়লোকের মেয়ে....

বলেছিলেন, মনেও আছে। কিন্তু আপনার মুখের কথা বিশ্বাস করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। মিলি আপনাকে কোনো জবাব দেয়নি ?

না, মনে পড়ে না।

মনে পড়ে না মানে ?

লিখিত কোনো জবাব কখনো দেয়নি।

তাহলে মৌখিক জবাব দিয়েছে ?

ঠিক তাও নয়।

তবে ?

ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে চিঠি দেওয়া শুরু করার পর বেশ কয়েকদিন কটাক্ষ করেছিল।

কটাক্ষ ? এ তো সংস্কৃত সাহিত্য। এখনকার মেয়েরা কটাক্ষ করে নাকি ?

আমি ওর চোখের ভাষা ঠিক বুঝতে পারিনি।

কী মনে হত চোখ দেখে ? প্রশ্রয় না রাগ ?

মাথা নেড়ে আমি বললাম, ওসব নয়। মনে হত একটি গভীর রহস্য যেন কিছু বলি-বলি করেও বলতে চাইছে না।

যাজ্ঞসেনী গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মাই গড ! ইউ আর রিয়েলি ইন লাভ !

আমি কুণ্ঠিতচরণে আবার একটু পিছিয়ে গিয়ে বলি, প্রেমে পড়লে কিরকম সিমটম হয় তা আমি কিন্তু জানি না।

যাজ্ঞসেনী চিঠির গোছাটা ঘৃণাভরে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি না জানলেও আমি জানি। ইউ আর হেল্পলেসলি ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলাম।

যাজ্ঞসেনী ওয়ার্ডরোব খুলল। গোছা গোছা ড্রেস বের করে ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর। পেল না। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার লণ্ডভণ্ড করল। লোহার আলমারিটা চাবি বন্ধ করে গেছে বটে মিলি, কিন্তু চাবিটা আলমারিতেই ঝুলছে। যাজ্ঞসেনী সেটা খুলে ফেলল। আরো কিছু জিনিস ওলটপালট হল। কে এগুলো ফের গুছিয়ে তুলবে তা নিয়ে যাজ্ঞসেনীর কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমার আছে। আমি আতঙ্কিতভাবে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ কেন মেয়েটা ক্ষেপে গেল তা বুঝতে পারলাম না। আমার লেখা প্রেমপত্রগুলোই অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল নাকি ? যাজ্ঞসেনী মুখ ফিরিয়ে তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, একটু হেল্পও তো করতে পারেন ! বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

আমার হেল্প করার কথা নয়, বরং বাধা দেওয়ারই কথা। তাই আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, বইগুলো ঘরে নেই যাজ্ঞসেনী, আমি জানি

আমিও জানি। তবু একটা কিছু আমাকে করতেই হবে। জাস্ট ফর রিভেঞ্জ। কাম অন, লেট আস মেক এ হেল আউট অফ ইউ। কাম অন। কাম অন।

কাম অন ! কাম অন ! চেঁচানিটা আমার কানে তালা ধরিয়ে দিল। জোয়ান অফ আর্ক স্বদেশবাসীকে ঠিক এইভাবেই যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কি ? কে

জানে ! তবে আমি যাজ্ঞসেনীর ওই যুদ্ধযাত্রার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়ে হাত লাগালাম।

যদি এ থেকে আমাকে কেউ অবিশ্বাসী বা বিশ্বাসঘাতক মনে করেন তা হলে ভুল করবেন। ভেবে দেখলে গদাই বোস, মিলি বা মিলির মায়ের ওপর আমারও কি প্রতিশোধ জমা নেই ? একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে গদাই বোস আমার আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছেন বটে, কিন্তু নিরন্তর এই সব ঐশ্বর্যের কাছাকাছি বাস করে আমার ভিতরে ভিতরে আত্মগ্লানির এক পাহাড় জমে উঠেছে। যেমন তেমন পাহাড় নয়, তার ভিতরে উত্তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটছে। হায়, তার বেরোবার উপায় নেই। আমি সযত্নে সেটার ঢাকনা এঁটে রাখি। বহুবল্লভা মিলি খুব স্পষ্টভাবেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পাত্তা দেয়নি। আমার আহত মর্যাদা বহুদিন ধরে প্রত্যাঘাতের সুযোগ খুঁজছে। পায়নি। আমি একথাটাও ভুলতে পারি না যে, গদাই বোসের বউ আমাকে বাড়িতে পাহারা রেখে গেছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। তাই মাত্র গোটা তিনেক ঘর বাদে আর সব ঘরে তালা দিয়ে গেছে। এই অবিশ্বাস আমাকে নিয়ত খোঁচা মারছে। আমাকে অপমান করেছে গদাই বোসের কুকুর, ঝি। আমার আত্মা হাহাকার করে যখন আমি গদাই বোসদের ঝকঝকে ডাইনিং টেবিলে বসে কুসুমের আনা তুচ্ছ সব খাবার খাই আর কুসুম যখন জিমের খাবার থেকে চুরি করে মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেয়। ফলে বিদ্রোহের একটা বীজ আমার ভিতরে ছিলই। উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে সেটা এতকাল অঙ্কুরিত হয়নি। যাজ্ঞসেনী শুধু সেই অঙ্কুরোদ্গমের কাজটুকু করেছে। সত্য বটে যাজ্ঞসেনী বড়লোকের মেয়ে। সম্ভবত ওর বাবা একজন দুঁদে ক্যাপিটালিস্ট। এবং ওর বিদ্রোহের কারণ মাত্র তিনটি বই, তুচ্ছ তিনটে বই। এও সত্য যে, আমি সমাজের অত্যন্ত নীচুতলার লোক। যাজ্ঞসেনীর সঙ্গে আমার শ্রেণীগত দূরত্ব অনেক। এবং আমার বিদ্রোহের কারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু ভারী মিলে গেল দুজনের মনোভাব।

যাজ্ঞসেনী একটা জর্জেটের শাড়ি বের করে একটু দেখল, বলল, হুঁ, তিনশো টাকার বেশী নয় !

বলেই সেটাকে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলল কার্পেটে।

আমি শাড়িটা তুলে নিলাম। তিনশ টাকা ! তিনশ টাকা ! আমার মা বা বোনেরা কখনো জনতা শাড়ি ছাড়া কিছুই পরেনি। রাগে শাড়িটা ডলে মুচড়ে আমি ছুঁড়ে দিলাম ঘরের নোংরা একটা কোণে।

যাজ্ঞসেনী একটা লিপস্টিকের গায়ে নাম দেখে নিয়ে বলল, দশ টাকায়

ফুটপাথে বিক্রি হয়। আহা রে, কী বড়লোক!

ঘৃণাভরে যাজ্ঞসেনী সেটা ছুঁড়ে দিতেই আমি লুফে নিই। দশ টাকার লিপস্টিক! দশ টাকা! আমার বোনেরা দু টাকার লিপস্টিকের স্বপ্নও দেখে না। আমি লিপস্টিকটা আক্রোশভরে ছুঁড়ে মারলাম দেয়ালে।

যাজ্ঞসেনী একটা টেপ রেকর্ডার ছুঁড়ে ফেলল বিছানায়। আমি সেটা ফেললাম কার্পেটের ওপর।

এইভাবেই চলতে থাকল।

একটা কাচের শো-কেস থেকে সাজানো পুতুল একটা একটা করে বের করে ফেলে দিচ্ছিল যাজ্ঞসেনী, আমি পাঁজা ধরে ফেলে দিতে লাগলাম।

যাজ্ঞসেনী একটা রূপোর ট্রে তুলে নিয়েছিল হাতে। ফেলতে ইতস্তত করছিল। আমি তার হাত থেকে নিয়ে মেঝেয় ফেলে পা দিয়ে দুমড়ে দিলাম।

উদ্বুদ্ধ যাজ্ঞসেনী একটা কাটগ্লাসের শো-পিস ছুঁড়ে মারল দেয়ালে।

আমি বলে উঠলাম, সাবাস!

আমি একটা পোর্টেবল রেডিও লাথি মেরে বহুদূর পাঠানোয় যাজ্ঞসেনী আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, এই তো চাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিলির ঘর স্তূপাকার জিনিসপত্র, কসমেটিকস, ঝুটো গয়না বই কাগজ চিঠি ক্যাসেট ইত্যাদির এক পাগলা-গারদ হয়ে গেল।

কপালের টিপ লেপটে গেছে, রিবনে বাঁধা চুল খুলে উড়োখুড়ো, ওড়না খসে পড়ে গেছে। ঘন শ্বাসে ওঠাপড়া করছে বুক। ঈষৎ ঘর্মাক্ত লালচে ও উজ্জ্বল মুখে চারদিকে চেয়ে দেখল যাজ্ঞসেনী, তারপর আমার দিকে ফিরে কোমরে হাত দিয়ে বলল, ইজ ইট এনাফ?

কোনো খুঁত আছে বলে আমারও মনে হল না। তাই মাথা নেড়ে বললাম, চমৎকার।

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার লক্ষ করল যাজ্ঞসেনী। কটাক্ষ কিনা তা বোঝা গেল না। শুধু বলল, ক্রীতদাস।

যাজ্ঞসেনী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ আমার ঘোর কাটেনি। খানিকটা কল্পনা আর খানিকটা বাস্তবকে মিশিয়ে এক আশ্চর্য কম্পাউণ্ডার আমার ভিতরে একটা মিকশ্চার তৈরি করছে।

সন্ধের মুখে টেলিফোনটা এল।

দোস্ত। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

কোন কাজটা রে ট্যাপা?

তুমি কথা দিয়েছিলে চিমনিকে কখনো শো করবে না।

করিনি তো?

দোস্ত, মুর্গী নে ঝুট বোলা মুর্গীকা চুচু হো গই।

তার মানে?

ঝুট বোলো না দোস্ত, আজ তোমার কাছে চিমনি এসেছিল।

আমি আঁতকে উঠে বলি, কখন?

ঢপ দিও না দোস্ত। খুব গ্রীণ মেরে এসেছিল, তবু ঠিক চিনে লিয়েছি।

গ্রীন! ওঃ, সে চিমনি নয় রে ট্যাপা।

বলেছি তো দোস্ত, ঢপ দিও না। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

তুই কোথায় ছিলি?

ফটকের বাইরে। আমার এক বন্ধুর অসুখ বলে একটু ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। চিমনিকে দেখে কেটে পড়তে হল।

কার অসুখ?

তুমি চিনবে না দোস্ত।

কী অসুখ?

সব রকম।

তার মানে?

সব রকম মেডিসিন লাগবে। ভিটামিন, পেনিসিলিন, কাফ সিরাপ, ভাইনাম গ্যালেসিয়া···

বুঝেছি। চারু ডাক্তারের দোকানে বেচবি তো!

চিমনিকে আনিয়ে তুমি ঠিক কাজ করোনি। যদি আমাকে চিনতে পারত?

আমি আনাইনি। নিজেই এসেছিল।

তবে আসলি বাতটা না ঝেড়ে এতক্ষণ ভ্যানতারা করছিলে কেন?

চিমনির কি আসতে নেই রে?

তুমি একটা কাজ করবে দোস্ত?

বল না।

আপন গড বলো করবে?

আগে শুনি তো।

চিমনিকে আমার সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও।

বলিস কি?

ভিড়িয়ে দাও দোস্ত। নইলে প্রেস্টিজ কবে পাংচার করে দিয়ে যাবে।

ভিড়িয়ে কী করবি ?

সাদী কর লুঙ্গা দোস্ত। সাদী হলে আর নফরৎ করতে পারবে না।

পাগল। সে তোকে সাদী করবে কেন ? চিমনির কোয়ালিফিকেশন জানিস ?

জানি। তুমিই বলেছো। ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট।

আরে দূর। তোর কেবল মস্তানী বাত। ওর কী এডুকেশন জানিস ?

না দোস্ত। খুব বেশী লেখাপড়া শিখে ফেলেছে নাকি ?

একটু ভেবে চোখ বুজে বলে ফেললাম, এম এস-সি ফার্স্ট ক্লাস।

মেয়েছেলেরা এত লেখাপড়া শেখে কেন বলো তো।

চিমনি যে দারুণ মেরিটোরিয়াস।

তাহলে এক কাজ করবে ?

কী কাজ ?

ওকে অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দাও। ওখানে এই সব গুড়িয়া খুব নিচ্ছে।

একদিন হয়তো যাবে।

সে কবে যাবে সেই জন্য বসে থাকবে নাকি ? পাঠিয়ে দাও দোস্ত। চিমনি ইণ্ডিয়ায় থাকলে আমার শান্তি নেই।

হবে রে ট্যাপা হবে।

দোস্ত। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

কর না।

চিমনিকে তুমি আজ আনিয়েছিলে কেন ?

বললাম তো আনাইনি। নিজেই এসেছিল।

দোস্ত, মাঝে মাঝে গদাই বোসের স্যাম্পল ফাইল নিয়ে চারুর দোকানে ঝেড়ে দিই বলে শালা আমাকে ভড়কানোর চেষ্টা করোনি তো ?

মাইরি না।

তুমি বহুত টিকরমবাজ আছো দোস্ত। শোনো, সাফ বলে দিচ্ছি। চিমনির একটা ফাইন্যাল করে ফেল। হয় আমার সঙ্গে সাদী, নয়তো অ্যামেরিকা।

আচ্ছা ভেবে দেখি।

আর একটা বাত দোস্ত। ওই বুড়োটা বহুত হেক্কোড় আছে।

কোন বুড়ো ?

সেন্ট্রাল রোডের সেই জমিনদার বুড়োটা। মাইরি, বটগাছের মতো জমির মধ্যে ওর শেকড় ঢুকে গেছে। ওপড়ানো যাচ্ছে না।

তুই গিয়েছিলি ?

আলবাৎ। কাল সাঁঝের বেলা গিয়ে বহোত চিল্লাচিল্লি মাচালাম।

কাজ হল না।

একটা হ্যারিকেন আর একটা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এল। ভাবতে পারো দোস্ত, সেভেন্টি আপ একটা হাড্ডিগুড্ডি সার বুড়ো এক হাতে হ্যারিকেন আর দুসরা হাতে কুড়ুল ? তাও বিফোর মি—দি গ্রেট ট্যাপা ?

বিফোর মি হবে না রে ট্যাপা, হবে—

বাতেল্লা ছোড়ো ইয়ার। জানি তোমরা হাই ফ্যামিলি। তুমি শালা অনার্সের পিণ্ডি চটকেছো, তোমার মর্দানা-মার্কা বোন এম এস-সি চটকে বসে আছে। কিন্তু ডোণ্ট টিচ ট্যাপা ইংলিশ।

ঠিক আছে। বুড়ো কী বলল ?

শুধু বুড়ো নয়, বুড়ি ভী। আর দুটো ছেলে ভী।

সবাই মিলে তোকে তাড়া করল নাকি ?

না ইয়ার। তাড়া-ফাড়া করেনি। জাস্ট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একদম স্ট্যাচু।

তাতেই ভড়কে গেলি নাকি ?

গাটস দেখলাম দোস্ত। বহোত গাটস্।

তুই কী বললি ?

বললাম, হকের টাকা নিয়ে জমি ছোড়ো চাঁদু, নইলে বডি পড়ে যাবে।

আর কিছু ?

দুটো পটকা চার্জ করেছিল বিশে। ঘাবড়াল না।

কিছু বলল ?

যখন চলে আসছি তখন শুধু ডেকে একটা বাণী দিল। বলল, শোনো বাবা, তোমরা রোজ এসো। চেঁচামেচি কোরো। বোমা-টোমাও আনতে পার। কিন্তু জ্যান্ত আমাকে তুলতে পারবে না এই জমি থেকে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, তারপর ?

ট্যাপা বলল, বাঙালী-ফাঙালী নিয়ে অনেক বাতেল্লা দিল। লং বাণী ইয়ার। অত মনে নেই। তবে তখন শুনতে শুনতে বেশ একটু গরম হয়ে গিয়েছিলাম। আচ্ছা দোস্ত, বাঙালীদের কি সব সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেবে নাকি ? না মানা ক্যাম্পে ?

ওসব বলছিল বুঝি ?

বুড়ো খুব জ্ঞানবাজ লোক দোস্ত। বহোৎ জ্ঞান। শালা বাঙালী যে এক

নম্বরের হারামী আর বাঙালীই যে বাঙালীর শত্রু সেটা দারুণ সমঝে দিল।

তুই সমঝে গেলি ?

বেশ লাগল দোস্ত। আর বুড়োটা মাইরি কাঁদছিল। আমি কালই বুড়োকে ফুটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হবে না। বহোৎ রি-অ্যাকশন হবে।

কেন, রি-অ্যাকশনের কী দেখলি ?

অনেক লোক জমে গেল চারদিকে। পাবলিক।

পাবলিক ?

হ্যাঁ ইয়ার। পাবলিকের মহব্বৎ তো জানো। শালা কখন বিগড়ে যাবে আর কোন কিচান করবে গড নো নোজ। কাল ভী বহোৎ পরেসানী গেছে।

পাবলিক বিগড়েছিল ?

প্রথমটায় নয়। কিন্তু বুড়ো যখন বাণী দিচ্ছিল তখন এক শালা রুস্তম হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, এই সেই কনট্রাকটরের গুণ্ডারা এসেছে, মারো শালেকো—

বলিস কি ? তারপর ?

সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ইঁট। তিন চারটে রডও বেরিয়ে পড়ল। আমরাও লড়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সেই বুড়োটা এসে কিচানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের শীল্ড করে পাবলিককে বলল, এদের দোষ নেই। টাকা খেয়ে এসব করছে। আসল অপরাধী এরা নয়। যারা এদের কাজে লাগাচ্ছে তারা। এদের মেরে তাড়ানো যাবে। কিন্তু যারা এদের কাজে লাগাচ্ছে তারা আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু তাদের নাগাল আমাদের পেতেই হবে—

পুরো লেকচার ঝাড়ল নাকি ?

দারুণ। একটু কাশি উঠছিল মাঝে মাঝে, শ্বাসের কষ্টও। তবু যা বলল।

তুই চমকে গেছিস মনে হচ্ছে।

না ইয়ার। বিগ বিগ বাত আমি অনেক শুনেছি। বাত ইজ বাত, বিজনেস ইজ বিজনেস। কথা সেটা নয়। বুড়োকে যা বুঝলাম ওসব চিল্লাচিল্লিতে কাজ হবে না। পেটো ফেটো দিয়ে ভড়কানো যাবে না। মাল বহোৎ টাইট।

তাহলে ? পুপু যে—

পুপু ফুফু জানিনা দোস্ত। যদি ক্যাচ আউট করতে চাও তো আরো মাল ছাড়তে হবে। কেস আমি করে দেবো।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, লোকটার কাছে আমি ছেলেবেলায় পড়েছি ট্যাপা।

এই তো তোমার সেন্টুতে আবার লেগে যাচ্ছে দোস্ত।

সেন্টুতে কিনা জানি না, তবে কোথাও একটু লাগছে।

আরে ছোড়ো ইয়ার। মাল তো কেওড়াতলার টিকিট কেটেই বসে আছে। দুদিন এদিক ওদিক।

জানি। তবু আমাকে একটু চেষ্টা করতে দে।

কেস বিলা আছে দোস্ত। এ মাল নড়বার মাল নয়। পিওর বাঙাল ভাষায় অ্যায়সা তড়পাচ্ছে যে চারদিক গরম হয়ে আছে। তোমার পুপুর অর্ডার নিয়ে এসো দোস্ত, আমি বউনিটা করে ফেলি। সব কিচান ফিনিশ করেছি শালা, কিন্তু একটাও মার্ডার নেই আমার। ভাবতে পারো ?

তুই বড্ড গোঁয়ার গোবিন্দ আছিস ট্যাপা। মার্ডার করার আগে বুদ্ধিমানরা সাতবার ভাবে। পুলিশ আছে, পাবলিক আছে, কোর্ট আছে—চারদিকে ফিল্ডার, কে ক্যাচ করে দেবে ঠিক আছে ? আগে এসকেপ রুট ভেবে রাখতে হয়। ঠাণ্ডা মাথা লাগে। হিসেব নিকেষ লাগে।

তবে শালা তুমি বসে বসে আঙুল চোষো। শালা কেবল ব্রেন-এ ক্যালকুলেটর খটাখট করে যাচ্ছো। এদিকে তুমি গেঁড়েমি করবে আর অন্যদিকে কোন খানকির ছেলে কেস ফিনিশ করে চাক্কি ঝেঁকে নেবে। তখন আঁটি চুষতে হবে।

খুন খুন করে অত হন্যে হয়ে পড়লি কেন ? আগে দেখি।

আরে ইয়ার, দিল ভাল নেই। দুখ লিও না। খালপাড়ে একটাকে নামালাম, লাইনের ধারে আর একটাকে। শালা হাড্রেড পারসেন্ট টিকিটকাটা কেস। বুঝলে ! আপ অন গড। কিন্তু শালা অকসিজেন-ফকসিজেন পেঁদিয়ে দুটো মালই ব্যাক করে এল।

দেখ ট্যাপা, আমি তোর দুটো কেসই জানি। ওর মধ্যে একটা ছিল পার্টির ছেলে। যদি তোকে চিনতে পেরে থাকে তবে দিনে-দুপুরে এসে পার্টির ছেলেরা তোর লাশ নামিয়ে দিয়ে যাবে। কাজটা ভাল করিসনি। মাথাটা আর একটু খাটাতে হবে ট্যাপা। তোর সব আছে, ব্রেন নেই।

তোমার শালা ট্র্যানজিস্টার আপ আছে, জানি। আমারটা ডাউন সেও জানি। কিন্তু এই সুড্ডা তোমাকে দুপাতা নামতা পড়িয়েছে বলে কি সাঁইবাবা হয়ে গেল নাকি ? ওসব ক্যালকুলেটার-ফ্যালকুলেটর বাজে কথা ইয়ার, আসলে তোমার সেন্টুতে লাগছে।

সেটা বেশী দিন আর লাগবে না রে ট্যাপা। ভাবিস না। দুটো দিন সময় দে।

ঠিক হ্যায় দোস্ত। এখন বলো চিমনির কী হবে ?

কী হবে ?

আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে ?

ওকে ভুলে যা ট্যাপা।

মেয়েছেলের হাতে ইনসাল্ট কি কেউ ভোলে ? তুমি ওকে বরং একটা কথা সাফ সাফ বলে দাও।

কী কথা ?

বলে দাও যে ম্যয় উসকো মহব্বৎমে গির গিয়া।

তাতে লাভ নেই। চিমনির মহব্বৎমে রোজই এক-আধজন গির যাতা হ্যায়। ও কাউকে পাত্তা দেয় না।

আমাকে দেবে। তুমি একটা কাজ করো। ওর কাছে আমার কোয়ালিফিকেশনটা বাড়িয়ে দাও।

কী বলব বল তো ! তুই ডবল এম এ ?

আরে না দোস্ত, এখনো আমি এডুকেশন বানানটাই ভাল করে জানি না।

তাহলে আর কী কোয়ালিফিকেশন আছে তোর ?

বলে দিও আমি কিশোরের মতো গান গাইতে পারি। ডিসকো নাচ ভি জানতা হ্যায়। দেখতে অনেকটা বিনোদ খান্না। আর বোলো দুটো মার্ডার চার্জ আছে আমার নামে।

ও প্রথমেই এডুকেশন জানতে চাইবে।

এগুলো কি এডুকেশন নয় দোস্ত ? আমার রোজগার কত জানো ? মাস্থলি ওয়ান থাউ।

ওতে হবে না ট্যাপা।

আরে দোস্ত, হিরোইন প্রথমটায় ওরকম বিলা থাকে। পরে খুব টাইট খেয়ে যায়।

তুই যখন বলছিস, বলে দেখব।

॥ ৩ ॥

পুব থেকে ঠেলা দিয়েছে বাংলাদেশ, পশ্চিম থেকে বিহার। উত্তর-পুব থেকে ঘাড় মুচড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আসাম। মাথায় তিনটে গাঁট্টার মতো বসে আছে ভুটান, নেপাল আর সিকিম। এইসব নানা দিকের চাপে চিড়ে চ্যাপটা, সরু, বৃহৎ সংসারের ভারে জরাজীর্ণ কেরানীর বিগত যৌবনা স্ত্রীর মতো রোগা ভোগা এই যে রাজ্যটি এর নাম পশ্চিম বঙ্গ। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের একমাত্র আসমুদ্রহিমাচল রাজ্য। সত্য বটে বিস্তর কবি, বুরবক এবং ছেনাল এই রাজ্যের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি চোখের জল ফেলেছে, ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখেছে, লাঠি গুলিও খেয়েছে কেউ কেউ। কোনো মানে হয় না। একসময়ে বঙ্গভঙ্গ রুখেছিল কিছু সেন্টুমার্কা বাঙালী। তাতে হল কী ? পরে বারো আনা বাংলা দেশ পাকিস্তানের ভাগে ফুটে গেল তো ? বিধান রায়ের আমলে বাংলা-বিহার একাকার করার একটা প্রেম উথলে উঠেছিল, কিছু কালচার-গেঁড়ে বাঙালী সেটা আটকায়। কিন্তু বুরবক বাঙালীদের ছোলাগাছি দেখিয়ে কিছু সেয়ানা দু নম্বরী বাঙালী খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে দেশটাকে মাড়োয়ারী, কালোয়ার, দক্ষিণী লোকের কাছে একটু একটু করে বেচে দিচ্ছে না ? "ও আমার সোনার বাংলা···" বলে যারা বিলাপ করে মরে সেই শালারা কি জানে যে, পায়ের তলা থেকে বাংলার কার্পেটখানা খুব মোলায়েম হাতে টেনে নিচ্ছে অন্য লোক ? বাংলা-বাংলা করে দেয়ালা করার মাইরি কোনো মানে হয় ?

তুই কেডা রে ? ছাত্তর ?

যতদূর মনে পড়ে সতীশবাবু যখন আমাদের পড়াতেন তখন বাঙাল ভাষা ব্যবহার করতেন না। কথায় এবং উচ্চারণে একটু বাঙাল উনি ছিল মাত্র, নইলে কলকাতার ভাষাতেই দিব্যি চালিয়ে যেতেন। এখন বিশুদ্ধ বাঙাল উচ্চারণ শুনে একটু ব্যোমকে গেলাম। উনি এখনো দরজা খোলেননি। জানালা দিয়ে গভীর সন্দিহান চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। হাতে একখানা হ্যারিকেন। নিরীক্ষণ করছেন কথাটা বোধকরি ঠিক হল না। কারণ বাইরে অন্ধকার, ভিতরে হ্যারিকেনের আলোয় এই বয়সের দুর্বল চোখে নিরীক্ষণ করা কি সোজা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

নাম কী ?

সুবীর লাহিড়ি স্যার।

কত সাল ? কত বছর আগে ?

তা স্যার, বিশ বছর আগে।

দেখ বাবা, ভোগা দিতে আহো নাই তো !

ভোগা কী স্যার ?

আইজকাইল মাঝে মইধ্যেই একটা দুইটা ছ্যামড়া আইয়া কয় স্যার, আমি আপনের ছাত্তর। ত্রিশ বচ্ছর আগে আছিলাম। এইটা ওইটা কয়, ইতি উতি চায়, তারপরেই জিগায়, স্যার, আপনের জমিটা বেচবেন ? তাই কই বাপু, তোমার

মতলবখান কী ?

কেমন আছেন দেখতে এলাম স্যার।

এতকাল মনে পড়ে নাই ? তাও ভর সন্ধ্যাকালে !

আমি এতদিন বাইরে ছিলাম স্যার।

কোনখানে ?

চট করে কোনো নাম মনে পড়ছিল না। মাথা চুলকে বললাম, মহারাষ্ট্রে। এখানে তো স্যার, চাকরি-বাকরি জুটল না।

আর জুটবোও নে। হক্কলেরে খেদাইয়া ছাড়ব। সইত্য সইত্যই ছাত্তর ছিলা তো ! মিছা কথা তো না !

একবার স্যার আপনি আমাকে ক্লাসের বারান্দায় নীলডাউন করিয়ে রেখেছিলেন। বৃষ্টি পড়ছিল বলে ফের আপনিই এসে মাথায় ছাতা ধরেছিলেন। সেই কথাটা আজও ভুলতে পারিনি।

কী নাম কইলা ?

সুবীর স্যার, সুবীর লাহিড়ী।

সুবীর ! এ ভেরি কমন নেম। খাড়াও, তোমার মুখখান দেখি।

এই বলে সতীশবাবু দরজা খুললেন। ট্যাপা মিছে বলেনি। এক হাতে হ্যারিকেন, অন্য হাতে কুড়ুল। কুড়ুলের পাকা বাঁশের আছাড়ি বেশ শক্ত মুঠোয় ধরে আছেন।

একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলি, স্যার, কুড়ুল কেন ?

এই হইল তোমার পরশুরামের কুঠার। দিনকাল ভাল না বইল্যা কাছে একখান অস্তর রাখি। খাড়াও, আগেই ঢুইক্যা পইড়ো না। মুখখান আগে দেখি।

সতীশবাবু হ্যারিকেন তুলে আমার মুখ দেখতে লাগলেন। আমি দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকি। নাকে কেরোসিনের ধোঁয়া আসে, তাপ লাগে মুখে। তবু হ্যারিকেনের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি মুখটা এগিয়েও দিই।

সতীশবাবু গুণ গুণ করে উঠলেন, বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে চইলে যায় তারা কলরবে। কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয় যৌবনের শ্যামল গৌরবে···বোঝলাআমি যাগো পড়াই তারা সব গুড়ি গুড়ি, মাটির লগে কথা কয়। বয়সকালে গিয়া কোনটায় বাঘ কোনটায় সিংহ হইল হেই খবর আর পাই না। তবে তোমার মুখখান যেন চিনা-চিনা লাগে।

প্রণাম করে বললাম, স্যার, আপনার কত ছাত্র, সবাইকে কি মনে রাখা সম্ভব ! তবে আমি খুব বাঁদর ছিলাম।

বান্দর না কেডা ? হক্কলগুলিই বান্দর আছিল। অখনও বান্দর। বান্দরে বান্দরে দ্যাশটা ভইরা গেল। তোমারও হাতে এইটা কিয়ের বাক্স ? সন্দেশ !

এই স্যার একটু। খালি হাতে আসতে নেই তো !

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। কী কাম করো ?

এই সামান্য চাকরি স্যার।

সামাইন্য চাকরি মানে কি কেরাণী নাকি ?

ওইরকমই আর কি।

তা হেই সামাইন্য চাকরিটাও তোমারে বেঙ্গল দিতে পারল না ? মহারাষ্ট্রে যাইতে হইল ?

বেঙ্গলে কোনো প্রসপেক্ট নেই স্যার। ওসব রাজ্য অনেক অ্যাডভান্স।

হেইরেই তো হক্কলে কয়। কিন্তু বেঙ্গলে নাই ক্যান হেইটাই জিগাই। কইতে পারো বেঙ্গলে ক্যান কিছু নাই ?

স্যার, আপনি আগে তো এত বাঙাল কথা বলতেন না !

না, আইজকাইল কই। ক্যান, তুমি বাঙ্গাল কথা বুঝতে পারো না ?

একটু অসুবিধে হয় স্যার। অভ্যেস নেই কিনা।

সতীশবাবু দরজাটা ছেড়ে ভিতরে সরে গিয়ে হঠাৎ ভাষা পাল্টে ফেলে বললেন, এসো।

চারদিকে জলা জমির মধ্যে সতীশবাবুর ছেঁচা বেড়া আর টিনের চালের ঘর। সেন্ট্রাল রোডের প্রত্যন্তে এইসব জমিতে এখনো তেমন বাড়িঘর বসতি নেই। চারদিকে ঝোপঝাড় আছে, বড সড় কয়েকটা গাছও। জোনাকি পোকা দেখা যায়, ব্যাঙ এবং শেয়াল ডাকে। এক সময়ে ভেরেণ্ডা বন ছিল। দুঁদে জহুরীর চোখ অবশ্য ঠিকই টের পাবে যে, আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া এই জায়গাটার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কোথায় কী ডেভেলপমেন্ট হবে, কোথায় কোন স্কীম হচ্ছে তা এইসব জহুরীরা ভিতর থেকে অনেক আগেই খবর পেয়ে যায়। একদিন এখানে যে হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট বা শপিং সেন্টার এবং সুপারমার্কেট হবে তা আন্দাজ করা আমার মতো দূরদৃষ্টিহীনের পক্ষেও শক্ত নয়। কারণ পুপুর বাবা এই জায়গার প্রতি আগ্রহী। তবে এখন এই চারদিকে ঝিঁঝির ডাক, জোনাকির আলো, জলা জমির ওপর বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মাঝখানে সতীশবাবুর হ্যারিকেন-জ্বলা ছেঁচাবেড়া আর টিনের চালের ঘর বড় মানানসই। ঝোলা গোঁফ, সরু লম্বাটে চেহারার সতীশ ঘোষও যেন এই পারিপার্শ্বিকের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর গায়ে ফতুয়া এবং তুষের চাদর, পরনে ধুতি। মাথায় এক রাশ পাকায়

কাঁচায় চুল। বহুদিন চুল ছাঁটেননি। গত দিন তিনেক দাড়িও কামাননি বোধহয়। গাল কদমফুলের মতো হয়ে আছে।

সতীশবাবুর ঘরে বেশী আসবাবপত্র থাকার কথা নয়। নেইও। একটা তক্তপোষ, গুটি দুই মোড়া, একটা বেঁটে সস্তা কাঠের আলমারি, পলকা আলনা। তবে ঘর এই একটাই নয়। আরো দু-তিনটে আছে। মাঝখানে মস্ত উঠোন, তার চারধারে আলাদা আলাদা ঘর। একটা মোড়া দেখিয়ে বললেন, বোসো। জুতোজোড়া কোথায় ছাড়লে?

আজ্ঞে বাইরে।

ভাল কাজ করোনি। কুকুরের বড় উপদ্রব। মুখে করে নিয়ে পালায়। ঘরে এনে রাখো।

তাই রাখলাম।

সতীশবাবু হ্যারিকেনটার একধারে একটা পুরোনো পোস্টকার্ড গুঁজে ছায়ার দিকটা নিজের দিকে রেখে আলোর দিকটা আমার দিকে ফেরালেন। অন্ধকার থেকে আমার আলোকিত মুখের দিকে জুল জুল করে চেয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম আমাকে নিরীক্ষণ করা ওঁর এখনো শেষ হয়নি। কিছু দেখা এখনো বাকি আছে। হাতের কাছেই কুড়ুলখানা। আমি ওকে সময় দিলাম।

অবশেষে সতীশবাবু বললেন, কতদিন দেশছাড়া আছো?

তা স্যার, বছর পাঁচেক।

তাহলে তো দেশের খবর কিছুই রাখো না।

আজ্ঞে না।

না রাখাই ভাল। দেশটা গর্ভস্রাবে ভরে গেল। বাঙালীকে দেখার কেউ নেই, বুঝলে? বাঙালী ইজ ফিনিশড। সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, বিধান রায়ের পর একদম ভ্যাকুয়াম। শেয়ালে শেয়ালের মাংস খায় না বলে জানতাম। এখন বাঙালী ইজ ইটিং বাঙালী। একটা সত্যি কথা বলবে?

কী স্যার?

তোমাকে কেউ পাঠায়নি তো! ওই সন্দেশের বাক্সটা খুব সন্দেহজনক।

সন্দেহ কিসের স্যার, একদম ময়রার দোকানের টাটকা জিনিস।

আরে জানি। বিষ মিশিয়ে এনেছো তা বলছি না। আজকাল আমাকে অচেনা লোক কিছু দিলে আমি কুকর আর বেড়ালকে আগে খাওয়াই, তারপর সেফ পিরিয়ড পর্যন্ত তাদের ওয়াচ করি, তবে খাই।

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি, কেন স্যার?

কারণ আছে হে। কিছু লোক পিছনে লেগেছে। তারা প্রায়ই নানারকম সব কাণ্ড করে। লোভ দেখায়, ভয় দেখায়, কাকুতি মিনতিও করে। তারা প্রায়ই নানান ধরনের দালাল পাঠায়। দালালরা কেউ কেউ পুরোনো ছাত্র সেজে আসে। অবশ্য আমার পুরোনো ছাত্র কেউ হতেও পারে। বিচিত্র নয়। এত বছর মাস্টারি করলাম, মানুষ ছাড়লাম আর কয়টা। পঙ্গপাল, সব পঙ্গপাল।

না স্যার, আমাকে কেউ পাঠায়নি।

সন্দেশের বাক্সটা ঘুঁষ নয় তাহলে?

আজ্ঞে না।

মুশকিল কী জানো, সকলেই সন্দেশের বাক্স হাতেই আসে। গত ছ-সাত মাসে যত সন্দেশ আমার বাড়িতে এসেছে তত সারা জীবনেও আসেনি। এখন সন্দেশ বাসী হয়, পচে, ফেলা যায়। কত খাবো?

কিন্তু এসব হচ্ছে কেন স্যার?

বাঙালী!

বাঙালী?

গভীর বজ্জাত এক জাত। আগে বাঙালীর ওপর আমার একটা ফেইথ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেটা নষ্ট হয়েছে।

বাঙালী কী করেছে স্যার?

কলকাতাটা নন-বেঙ্গলীদের বেচে দিচ্ছে। দেখছো না? কলকাতা যাবে, চব্বিশ পরগণা যাবে, বর্ধমান যাবে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ যাবে। ওয়ান ডে দেয়ার উইল বি নো একজিস্টেন্স অফ বেঙ্গল। আমার এই জমিটা কত কালের জানো? চল্লিশ বছর। পার্টিশানের অনেক আগে কেনা। আমার আর কিছু নেই। তবু আমাকে উচ্ছেদ করে এই জমিটা কিছু নন-বেঙ্গলীকে বেচার জন্য কয়েকজন বাঙালী উঠেপড়ে লেগেছে।

বলেন কী স্যার! এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

আমি তাদের বলেছি, এ ভাবেই একদিন কলকাতা বেঙ্গলীদের হাতের বাইরে চলে যাবে। যাবে কেন, গেছেও।

তারা কী বলে?

তারা দালাল পাঠাচ্ছিল এতকাল। পরশু একটা খুনীর দল পাঠিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আরো বহু দূর যাবে। আমার বড় ছেলেকে হাত করে ফেলেছিল একসময়ে। বুঝতে পেরে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছি। সে একদিন আমার ঘুমের মধ্যে দস্তখৎ করানোর চেষ্টা করে। না পেরে টিপসই নিয়ে বায়না

রেজিস্ট্রি করার চেষ্টা করেছিল। ভাবতে পারো ?

আমি একটু চিন্তিতভাবে বলি, তাহলে স্যার এত বিপদের মধ্যে আছেনই বা কেন ? প্রাণের চেয়ে তো জমিটা বড় নয়। ভাল দাম পেলে ছেড়ে দিন না কেন।

পাগল নাকি ? এ বাড়ি কি শুধু আমার ? আমার মা আর আমার পিতৃপুরুষের আত্মারা এ বাড়িতে বিজ বিজ করে ঘোরে।

আমি আঁতকে উঠে বলি, ভূতের বাড়ি নাকি স্যার ?

ভূত ছাড়া কি কোনো বর্তমান হয় ? এই যে জলজ্যান্ত আমি, এই যে তরতাজা তুমি, এই আমার বা তোমার পিছনে সর্বদাই কিছু ভূত আছে। আছে না ?

গাড়লের মতো একটু মাথা নাড়ি।

আমার মা ঢাকায় গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কোনোদিন কোথাও যেতে চাইতেন না। পার্টিশনের পর তাঁকে দেখাশোনার লোক ছিল না। তবু একা একাই ভূতের মতো বাড়ি আগলে পড়ে থাকতেন। কতবার আনতে গেছি, পায়ে ধরে সাধাসাধি কান্নাকাটি করেছি। শুধু বলতেন, ও বাবা, কইলকাতায় এইসব রাইং পাতিল হাড়ি কলসী পামু কই, এমন কামরাঙা গাছ, ঢেকির শাক, পগার, কচুবন, ধানের গোলা, গোয়াইল ঘর এইসব আমারে কে দিবো ? আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল মাকে আনবই। তাই দেশের বাড়ির মতো বাড়ি তৈরি করতে লেগে গেলাম। এ ধারটায় তখন লোকবসতি নেই, বাস রাস্তা নেই, ভেরেণ্ডা বন আর মশা। এইখানেই জমি নিলাম। বহুদিন ধরে অনেক কষ্টে আর অধ্যবসায়ে একটু একটু করে এই বাড়ি করেছি। দেখবে ? এসো।

সতীশবাবু হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কুড়ুলটা আর নিলেন না।

উঠোনের দিকে বারান্দায় বেরিয়ে তিনি হ্যারিকেনটা তুলে ধরে বললেন, সাড়ে তিন বিঘা জমি ছিল। আম কাঁঠাল কামরাঙা, পগার, গোয়াল ঘর, সুপুরির সারি কিছুই খামতি রাখিনি। ওই যে দেখছো রান্নাঘর, আমার স্ত্রী কাঠের জ্বালে রান্না করছেন, ওটাও হুবহু দেশের বাড়ির মতো। কলকাতায় কাঠের দাম বেশী, কাঠের জ্বালে রান্না করতে খরচ অনেক পড়ে যায়। তবু আমি প্রথা ছাড়িনি। পশ্চিমে পগার, উত্তরে বাগান, সব দেশের বাড়ির মতো। সেইরকমই চারখানা ঘর। ছেঁচা বেড়া, চালে টিন। কোনো খুঁত নেই। এই এতসব করার পর মাকে আনতে পেরেছিলাম। তবে একেবারে শেষ সময়ে। মাত্র তিনমাস বেঁচে ছিলেন। বুক ভরে আমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। তাঁর দাহ হয় ওই পূবের

জমিটায়।

সাড়ে তিন বিঘার আর কতটা আছে ?

সতীশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কী থাকবে ? দেশের বাড়ির ধোপা নাপিত পুরুত প্রজা অনেককে ধরে ধরে এনে বসালাম। জমি লিখে দিলাম। শুধু মার জন্য। যাতে দেশের বাড়ির পরিবেশটা পেয়ে মা খুশি হন। সেই তারাই সব ভাল দাম পেয়ে টাকার লোভে যে যার জমি বেচে উঠে গেল। পড়ে আছি আমি।

কাজটা কি ঠিক হচ্ছে স্যার ? আপনি একা !

একাই তো ছিলাম হে প্রথমে। এখন আবার একা। তাতে কী ? সুমুন্দীর পুতেরা জানে এ দেহে প্রাণ থাকতে সতীশ ঘোষকে তোলা যাবে না। জানে, তবু লোক পাঠায়। লোভ দেখায়। ভয় দেখায়। কিন্তু বলো তো বাপু, এ বাড়ি কি শুধু একটা বাড়ি ? তার বেশী কিছু না ?

শীতের উঠোনে কুয়াশার আবছায়া। কাঠের ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ। কোটা ডালের সুবাস। চারদিকে নানারকম গাছের আবছায়া মিলেমিশে একটা কুহক। একটা কচুবন চিরে ঢালু মেটে পথ নেমে গেছে ছোট্ট পগারে। সতীশবাবু আলোটা এগিয়ে ধরলেন, দেখেছো ? কে বলবে যে এ বালিখাড়ার সেই পগার নয় ? সেই কচুবন, বড়ই গাছ, করমচা, এভরিথিং। মাঝে মাঝে এ যে কলকাতা শহর তা আমারই মনে হয় না।

আমারও মনে হচ্ছিল না। মানুষের অধ্যবসায়ের কি বিপুল অপচয় ! একটা বিস্মৃত ফেলে-আসা গেঁয়ো বাড়ির রিপ্রোডাকশন গড়ে তুলতে প্রাইমারি স্কুলের গরীব শিক্ষককে কত না নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছে। এত করার পর যা দাঁড়িয়েছে তা আমাকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ বা প্রভাবিত করতে পারছে না। আমার ভিতরটা বরং হায় হায় করে উঠল। মুখে বললাম, বেশ হয়েছে। একদম গাঁয়ের বাড়ি বলেই মনে হয়।

হয় না ! বলো তাহলে এ বাড়ির সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু কতখানি।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, শুধু সেন্টিমেন্টাল ভ্যালুই নয় স্যার, মেটেরিয়াল ভ্যালুও বড় কম নয়। কিন্তু স্যার, একটা কথা।

কী কথা ?

এই বালিখাড়া গ্রামটা যদি আপনি সত্যিকারের কোনো গ্রামে গিয়েই তৈরি করতেন তাহলে আরো রিয়েল মনে হত। সেখানে ল্যাণ্ডসিলিং নেই, এত ট্যাক্স নেই, হাই রাইজ বিল্ডিংসের চাপ নেই।

সতীশ ঘোষ একটা উন্মত্ত হাঃ হাঃ হাসি হেসে বললেন, অনেকে তাই বলে বটে। আমার বড় ছেলেও বলেছিল। কিন্তু তোমরা বুঝবে না; কলকাতা শহরের মধ্যে চারদিকে তোমাদের ওই সব হাই রাইজের মাঝখানে আমার এই বালিখাড়া একটা রিভোলিউশন, একটা ওয়েসিস। একটা আশ্বাস এবং ভরসা। উইথ কলার ঝাড় অ্যাণ্ড করমচা, উইথ গোয়ালঘর অ্যাণ্ড পগার, উইথ উঠোন অ্যাণ্ড কাঠের জ্বাল এই বাড়িটা হবে দুনিয়ার অষ্টম আশ্চর্য। লোকে দেখতে আসবে। চোখের জল ফেলবে দেখে। কলকাতাকে বাঙালী বেচে দিচ্ছে অন্যের কাছে। লোকে দেখবে একজন বাঙালী সেই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। বুঝলে?

বুঝেছি স্যার।

অ্যাম আই রাইট?

মাথা চুলকে বলি, অনেকটা তাই মনে হচ্ছে স্যার।

হঠাৎ সন্দিহান হয়ে সতীশবাবু একটু ঝুঁকে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, তোমার বাঙালী সেন্টিমেন্ট নেই?

সভয়ে বলি, আছে স্যার।

সতীশবাবু ডাইনে বাঁয়ে নড়ে বলেন, আজকাল বেশীরভাগ ছেলে-ছোকরারই নেই। কেন নেই বলো তো! আমাদের ফার্স্ট সেন্টিমেন্ট ছিল নিজের গ্রাম। তারপর জেলা। তারপর প্রদেশ। তারপর দেশ। বালিখাড়ার প্রতি যেমন ফিলিং ইণ্ডিয়ার প্রতিও তাই। আমার মনে হয় কি জানো? চ্যারিটি যেমন বিগিনস অ্যাট হোম, তেমনি প্যাট্রিওটিজম জিনিসটাও বিগিনস অ্যাট দি ভিলেজ। আজকাল ছেলেদের সেই বেসিক ফিলিংটাই নেই। থাকগে, আজ অনেক রাত হয়েছে, রাস্তাটাও ভাল না।

ইংগিত বুঝে আমি বিগলিত মুখে বলি, তাহলে স্যার, আজ আসি। কলকাতায় কিছুদিন আছি। মাঝে মাঝে আসব।

আর আসবে কেন? নো, পয়েন্ট অফ কামিং এগেন।

আপনার কাছে এখনো অনেক শেখার আছে।

সতীশ ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চলে আসার সময় উনি হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে পথে আলো ফেলার চেষ্টা করলেন। আলো বেশীদূর এল না। অন্ধকারেই আমি জলা জমি, আঁদাড় পাদাড় পার হতে থাকি।

বড় রাস্তায় উঠতেই একটা টর্চের ফোকাস ঠিক মুখে এসে পড়ল।

এই যে দাদা, এখানে ঘুরঘুর করছেন কেন? কী চাই?

অন্ধকারে টর্চের আলোয় ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখেও লক্ষ করি, দশ বারোটি প্যান্টশার্ট পরা ছেলে বেশ তেড়িয়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাবড়াই না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। বললাম, সতীশ ঘোষ আমার মাস্টারমশাই।

যে আসছে সেই তো বলছে মাস্টারমশাই, ওসব ঢপ ছাড়ুন। কেসটা কী বলুন তো!

আমি একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, ওই একই কেস।

তার মানে?

জমিটায় উনি কতখানি শেকড় গেড়ে বসেছেন তা দেখতে এসেছিলাম। বুঝলাম কেস খুব গভীর। হবে না।

সতীশ ঘোষ এ পাড়ার লীডার তা জানেন?

কতদিন থেকে?

রিসেন্টলি হয়েছেন। আমরা ওঁকে লীডার হিসেবে নিয়েছি। ওঁকে এখান থেকে চালান দেওয়ার অ্যাটেম্প্ট হলে খুব মুশকিল হয়ে যাবে কিন্তু। কেটে পড়ুন।

ওদের মধ্যে একটা ছেলে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, আপনি কানুদা না?

হ্যাঁ। তুমি কে?

আমি কেতন। সুধীরের বন্ধু।

সুধীর আমার ছোটো ভাই। তার বন্ধু শুনে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, তা তোমরা এখানে কী করছো?

পাহারা দিচ্ছি।

পাহারা! কিসের পাহারা? চোর আসে নাকি?

না। দালাল আসে। এক বড় কন্ট্রাক্টর জমিটা কিনেছে। কী সব কমপ্লেক্স টমপ্লেক্স হবে। আমরা হতে দিচ্ছি না।

দিচ্ছো না কেন? কলকাতা শহরের মধ্যে এতটা জমি পড়ে থেকে মশার আস্তানা হবে তাই চাও? জমির দাম এখন সোনার মতো।

সে তো জানি। কিন্তু এ কথাটাও তো ঠিক যে কলকাতা শহর থেকে বাঙালী হটে যাচ্ছে! আমাদের খেলার মাঠ গায়েব হয়ে যাবে। আলো বাতাস বন্ধ হয়ে যাবে।

আবার ভালোও কিছু হবে। গোটা জায়গাটারই ডেভেলপমেন্ট হবে। রাস্তা হবে, পাইপের জল আসবে, পার্ক হবে, শপিং সেন্টার হবে।

ওসব আমাদের দরকার নেই।

তোমাদের ক্লাব আছে না একটা? অমর স্মৃতি ক্লাব না কী যেন!

আছে।

যদি সেই ক্লাবটার জন্য পাকা বাড়ি করে দেওয়া হয় তাহলে কেমন হবে? সঙ্গে লাইব্রেরি? টেবিল টেনিস বোর্ড?

কেতন নয়, অন্য একজন একটু রুক্ষ স্বরে বলল, ওসব অফার আমরা অনেক আগেই পেয়ে গেছি। সুবিধে হবে না দাদা, কেটে পড়ুন। আপনি কেতনের বন্ধুর দাদা, আপনাকে বেশী কিছু বলতে চাই না। তবে আপনার পাড়ার ট্যাপা এসে সেদিন খুব মস্তানী দেখিয়ে গেছে। আমরা সেদিন কেউ ছিলাম না বলে। এবার তাকে পেলে ওই জলার মধ্যে পুঁতে দেবো।

টর্চটা নিবে গেছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় ছেলেগুলোকে বেশ দেখতে পাচ্ছি। ছোটোলোকী চেহারা নয়। কথাবার্তাও ভদ্রতার ধারঘেঁষা।

কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বললাম, আমি যতদূর জানি সতীশবাবু ছাড়া আর সবাই কন্ট্রাক্টরকে জমি বেচে দিয়ে চলে গেছে।

গেছে তো কী? সতীশবাবু যাবেন না।

আমারও তাই ধারণা। থাকগে, আমি কারো দালালী করতে আসিনি। আমার এক বন্ধু একটু বাজিয়ে দেখতে বলেছিল। তাই দেখে গেলাম।

ঠিক আছে। আর ওসব মতলব নিয়ে আসবেন না। এই জমিটা এখন এ পাড়ার প্রেস্টিজের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। দরকার হলে লাশ পড়ে যাবে, কিন্তু জমি ছাড়া হবে না।

বুঝলাম। ঠিক আছে ভাই, আমি যাচ্ছি।

আমি জানি, দুনিয়ায় সৎ ও অসতের মধ্যে তফাৎ কেবল ডিগ্রির। আগাপাশতলা সৎ, নির্ভেজাল সাধু, হান্ড্রেড পারসেন্ট নীতিনিষ্ঠ মানুষ আজও কোনো মায়ের পেটে জন্মায়নি। যে লোকটা ঘুষ খায় না সে হয়তো হাজার টাকা অবধি সৎ। দশ হাজারে দোনোমোনো। লাখ টাকায় কাৎ। অবশ্য যদি ইহজন্মে তাকে লাখ টাকা অফার করার মতো ঘটনা না ঘটে তাহলে লোকটা ঘুষ না খেয়েই মানবজন্মটা কায়ক্লেশে কাটিয়ে দেবে। সেই হিসেবে লোকটা সৎ থেকে যাবে বটে, কিন্তু সেটা সিলিং-বাঁধা সততা। বলা যায়, লোকটার সততার সিলিং ছিল লাখ টাকা অবধি। কিন্তু কথা হল, সিলিংটাও তো কম বাধা নয়। অনেকের ওই সিলিংটাই থাকে ভীষণ উঁচুতে, যত উঁচু সিলিং তত বড় মহাপুরুষ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সতীশ-ঘোষও হড়কাবেন, তবে সেটা কততে বা কিসে সেটাই হল

ভাববার বিষয়। সকলে টাকার বশ নয়, কিন্তু তার অন্য কোনোরকম রন্ধ্র কোথাও থাকবেই। সেই রন্ধ্রটি খুঁজে পেলে কালনাগিনী ঢুকিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ নয়।

এসব কথাই আমি পুপুকে বুঝিয়ে বলছিলাম। রাত্রে। তার অফিসঘরে। পুপুর অফিসটা পেল্লায়। লেকমার্কেটের কাছে রাসবিহারীর ওপর তাদের অফিস। একটা মস্ত হলঘর পেরিয়ে এসেছি। সেই হলঘরে দেয়াল জুড়ে ড্রয়িং বোর্ড আর নকশা আঁকার হরেক সরঞ্জাম। একজন বুড়ো বেয়ারা ছাড়া কেউ নেই। সব খাঁ খাঁ করছে। পুপুর একখানা আলাদা নিজস্ব চেম্বার হয়েছে। বাহারী সেগুন কাঠের প্যানেল করা ঘর। একখানা 'এল' আকৃতির মস্ত টেবিলের ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে পুপু বসে আছে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ এসে গেছে এর মধ্যেই। টেবিলে সোনালী রঙের বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট, সোনালী লাইটার।

পুপু কি আজকাল একটু গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে? আহা, করুক। ওকে তাতে খারাপ দেখায় না। বরং বেশ ব্যক্তিত্ববান বলে মনে হয়। এরকম না হলে এই বিশৃঙ্খলার যুগে ব্যাদড়া কর্মচারীদের টিট রাখা শক্ত। কাজে ফাঁকি, অবাধ্যতা, হুমকি, ধর্মঘট কত কী সামাল দিতে হয় তাকে। সেইজন্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটু দুশ্চিন্তাও মিশে আছে কি! তবে কোনটা কত পারসেন্ট তা আমি বুঝবার চেষ্টা করলাম না। শুধু এটুকু বোঝা গেল, আমার সমবয়সী পুপুকে আমার চেয়ে ঢের বেশী বয়স্ক মনে হয়।

পুপু খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনল। তারপর ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে বলল, সতীশ ঘোষ পাড়ায় খুব পপুলার। ওপাড়ার যে পোলিটিক্যাল পার্টি পাওয়ারফুল তার নেতা মৃগাঙ্ক বোস একসময়ে অনুশীলন সমিতিতে ছিল, তা বলে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। কিন্তু সতীশ ঘোষের কথা তুলতেই হাতজোড় করে বলল, মাপ করবেন, পারব না। পাগল-টাগল যাই হোক, ওই একটা লোক আমাদের বিবেকের কাজ করে। জ্যান্ত বিবেক। পাড়ার ছেলেদের আলাদা করে বলে লাভ নেই, কারণ তারা মৃগাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধে যাবে না। তবু বলেছিলাম ক্লাবঘর পাকা করে দেবো। লাইব্রেরি করে দেবো। কিন্তু রাজী হয়নি। তাই তোর কথাতেই বলি, সতীশ ঘোষের সিলিং খুব হাই। এত হাই যে আমি নাগাল পাচ্ছি না। তুই কি পাবি?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, চেষ্টা করব পুপু। রন্ধ্র একটা পাওয়া যাবেই।

পুপু একটা হতাশার শ্বাস ফেলে বলল, রন্ধ্র খুঁজতে সময় লাগবে কানু। অত

সময় আমার হাতে নেই। আমাদের প্রোজেক্ট হচ্ছে টাইম বাউণ্ড কনট্রাক্টে। সময়মতো শেষ করতে না পারলে কয়েক লাখ টাকা বেরিয়ে যাবে। শুধু কি তাই ? এই প্রোজেক্টের জন্য আমার কয়েক হাজার টন সিমেন্ট কেনা আছে। তার জন্য গোডাউন ভাড়া কম গুনতে হচ্ছে না। বিভিন্ন সাব কন্ট্রাক্টর আর সাপ্লায়ারকে টাকা দিতে হয়েছে...বলতে গেলে মহাভারত।

আমাকে তুমি তাহলে কী করতে বলো পুপু ?

পুপু আমার দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু ওর আনমনা চোখ আমাকে ভেদ করে চলে গেছে। অনেকক্ষণ ওভাবে চেয়ে থেকে সে বোধহয় কল্পনার দৃশ্যে তার বিশাল কমপ্লেক্সের ছবি দেখে নিল। তারপর বলল, আমরা কখনো গুণ্ডাফুণ্ডা লাগাইনি ব্যবসার কাজে। বাবাও এ সব ব্যাপারের ডেড এগেনসটে। তবে—

তবে কী পুপু ?

বাড়িঘর করতে গেলে পাড়ার ছেলেদের হাত করতে হয়, পোলিটিক্যাল লীডারদেরও খুশি রাখতে হয়। এগুলো কমন প্র্যাকটিশ। আমরাও করেছি। শুধু এ কেসটার কোনো ব্রেক থ্রু হচ্ছে না। সেই ব্রেকটাই আমার দরকার এবং খুব তাড়াতাড়ি। সতীশ ঘোষের বড় ছেলেকে আমি হাত করে ফেলেছিলাম। সে হাজার দুই টাকাও খেয়েছে। তারপর বুড়ো টের পেয়ে ছেলেকে তাড়িয়েছে। সেই ছেলেটা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। সে আমাকে বলেছে যে তার বাবার ক্যানসার হয়েছে, বেশীদিন বাঁচবে না। বাপ মরে গেলেই সে জমি খালি করে দেবে। কিন্তু ছেলেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ক্যানসার হয়ে থাকলেও দু'চার মাসের মধ্যেই মরে যাবে এমন কথা নেই। আমি ততদিন অপেক্ষা করতে পারব না। ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং।

তুমি ফোনে আমাকে একটা আভাস দিয়েছিলে পুপু ! সেটারই ইঙ্গিত করছ কি ?

পুপুর ফর্সা মুখ লাল হল। চোখ সরিয়ে নিয়ে সে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল। তার অস্বস্তির কারণ আমি বুঝতে পারি। সে নিতান্তই ভদ্রলোক। সে এখনো কোনো খুনখারাবি ঘটায়নি। তার ভিতরে বিবেকের একটা লড়াই চলছে। সুমতি ভারসাস কুমতি। তবে সে সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি ডিটেলসে যেতে চাই না। এমন কি ঘটনাটা কী ঘটল না ঘটল তার রিপোর্টও জানতে চাই না। আমি চাই সিম্পল অ্যাণ্ড স্ট্রেট ইজেকশন। যদি জ্যান্ত লোকটাকে সরানো না যায়—

আমি মাথা নেড়ে বলি, জানি পুপু। সময় পেলে আমি রক্সটা খুঁজে

দেখতাম।

পুপু হতাশার ভঙ্গীতে হাত উল্টে বলল, আর কী রক্স থাকবে ? ওই জলা জংলা জমিটুকুর জন্য সতীশ ঘোষকে আমরা কত অফার করেছিলাম জানিস ? পাঁচ লাখ। লোকটা জাস্ট থুঃ বলে উড়িয়ে দিয়েছে অফারটা। পাঁচ লাখ, ক্যান ইউ ইমাজিন ?

পাঁচ লাখ শুনে আমারও বুকটা তড়াক করে উঠল একটু। সত্য বটে, টাকার দাম এখন খুব কমে গেছে। পঞ্চাশ দশকের তুলনায় হয়তো একটাকা মানে একটি সিকি মাত্র। কিন্তু পাঁচ লাখ এমনই একটা মন্ত্রপূতঃ শব্দ যে উচ্চারণমাত্র আমার হৃৎপিণ্ড নড়ে যায়। সতীশ ঘোষ পাঁচ লাখে টলেননি ! প্রাইমারি স্কুলের গরীব শিক্ষক হয়েও।

একটু সামলে নিয়ে বললাম, লোকটা পাগল পুপু।

সবাই তাই বলছে।

পাগলেরও রক্স থাকে পুপু।

পুপু মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু জানি না। আমি শুধু চাই এ ভেকেটেড ল্যাণ্ড। রক্স-টক্স তুই খোঁজ। যা করার তুই কর। জাস্ট কিপ দি ফ্লাই আউট অফ মাই সুপ। যা লাগে দেবো।

একটা মার্ডারের চার্জ কত জানো পুপু ?

পুপুর ফর্সা মুখ আবার লাল হল। আধখাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে দুমড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল, না। কত ?

আমি গলা খাঁকারি দিলাম। খুনের মজুরী আমার জানা নেই। তবে যাজ্ঞসেনী আয়ার বলেছিল, লোক বুঝে খুনের মজুরী পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার অবধি হতে পারে। কিন্তু সতীশ ঘোষ কেমন এবং কোন্ শ্রেণীর লোক ? তাঁর খুনের মজুরী কত হওয়া উচিত ? ট্যাপা মাত্র পাঁচশো টাকা হেঁকেছে। খুবই কম। কিন্তু জাতে ওঠার জন্য সে আরো কমেও রাজী হয়ে যাবে। তবে সেটা তো বাজারের দর নয়। খুব কম বললে পুপুও কি অবাক হবে না ?

খুব দ্রুতই আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম। একরকম মরীয়া হয়েই। বলতে কি টাকার অঙ্কটা উচ্চারণ করতে আমার গলা একটু কেঁপেও গেল।

দশ হাজার।

পুপু টেবিলের কাচে একটা পেপারওয়েটকে লাট্টুর মতো ঘোরানোর চেষ্টা করছিল। হচ্ছিল না। আমার কথাটা তার কানে গেছে বলেই মনে হল না। তবে কিছুক্ষণ চুপচাপ পেপারওয়েটটা নিয়ে খেলা করার পর সে একটা শ্বাস ফেলে

বলল, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কোনোরকম ঝামেলায় পড়ব না তো!

না। কথা দিচ্ছি। আমার ভদ্রলোক বন্ধু খুব বেশী নেই পুপু। তোমাকে আমি বিপদে ফেলব না। তোমার কি ছেলেবেলার কোনো কথা মনে পড়ে পুপু?

কী কথা?

যখন আমরা খুব গরীব ছিলাম তখন খুব বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। মনে পড়ে? তখন তুমি প্রায়ই আমাকে বলতে, কানু, আমরা বরাবর একসঙ্গে থাকব। কোনোদিন বিয়ে-থা করব না। একসঙ্গে খাবো, ঘুমবো, খেলবো। মনে পড়ে?

পুপু ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে শুনছিল। এবার একটু উদার হেসে বলল, মনে পড়ার সময় কোথায় আমার? কত কাজ।

তা বটে। তবে কি জানো, আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার কাছাকাছি থাকি। তোমাদের এই মস্ত বড় কোম্পানিতে আমার একটা চাকরি হয় না পুপু?

পুপুর মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। ধীর গলায় সে বলল, এটাও কি চার্জের মধ্যে নাকি?

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, না না, তা নয়। তুমি ভুল বুঝো না পুপু। আসলে কী জানো, একটা এরকম বাবু-বাবু জায়গায় এলে বেশ মনটা খুশি হয়ে ওঠে। তোমাদের অফিসটা কী সুন্দর!

পুপু মৃদু হেসে বলল, বাইরে থেকেই সুন্দর। ভিতরে ভিতরে প্রতি মুহূর্তে যে কী হাজার রকমের টেনশন তা তো জানিস না। পাগল হয়ে যাওয়ার দশা। কিন্তু তুই চাকরিই বা চাইছিস কেন? মস্তানরা তো আজকাল ভালই আছে।

আমি বিনয়ে একটু মাথা নত করি। তারপর বলি, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু নস্ট্যালজিয়া বলেও তো একটা জিনিস আছে। যে-পাড়ায় ধুলো কাদা মেখে খেয়ে না খেয়ে, কাটাছেঁড়া বল নিয়ে খেলে, ছেঁড়া জামা গায়ে বড় হয়েছি সেখানে ভদ্রলোক খুব কম ছিল পুপু। ভদ্রলোক কেউ এলে আমরা হাঁ করে দেখতাম। খুব শখ হত বড় হয়ে অফিসে চাকরি করব, ভদ্রলোক হবো।

দূর বোকা!

বোকামিই হবে। তোমরা যখন পাড়া ছেড়ে চলে এলে তখন যে কী কান্না কেঁদেছিলাম! পুপুরা ভদ্রলোক হয়ে গেল, আমরা তো হতে পারলাম না। সেই নস্ট্যালজিয়া এখনো তাড়া করে।

পাগল। চাকরিতে কিছু নেই। তোদের পাড়ার কত ছেলে আমার কাছে আসে, চাকরির জন্য ঘ্যানঘ্যান করে। আমি তাদের বলি, দেশে যত বেকার ছেলে আছে তত চাকরি আরো একশ বছরেও হবে না। তা বলে টাকা

রোজগারের পথ তো বন্ধ নেই। যা হয় একটা কিছু নিয়ে লেগে পড়ো। ফিরি করো, বিড়ি বাঁধো, শুধু বসে থেকো না। এভরিথিং পেজ। এই যে তুই—সেই ছেলেবেলার আধ-পাগলা, দুষ্টু, হাসিখুশি ছেলেটা—সেই তুই যে এখন মস্তানী করে বেড়াস এতে আমি খুশিই হয়েছি। ইন ফ্যাকট, এ রকম আণ্ডার ডেভেলপড সমাজব্যবস্থায় মস্তানদেরও একটা রোল প্লে করার আছে। এটাও একটা ক্যারিয়ার। তুই কেন তিন-চারশো টাকা মাইনের চাকরির জন্য হেঁদিয়ে মরবি? একটা মার্ডারে যদি দশ হাজার টাকা আসে—

আমি একটা ঢোঁক গিলি। কথাটা ঠিকই। কিন্তু পুপুকে কী করে বোঝাবো যে, মস্তান হওয়ার কোনো এলেমই আমার নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি উঠে পড়লাম।

॥ চার ॥

লোকটা ঠিক দুপুরবেলায় এল। মুখে একটা ফিচেল হাসি। দু হাত জোড় করে একটা নমো ঠুকে হেঁ-হেঁ করে বলল, আজ্ঞে, তিন দিন আসতে পারিনি। আসার অবস্থাও ছিল না কিনা।

আমি তটস্থ হয়ে বলি, আজ আর হবে না।

লোকটা নীচু গলায় বলল, কেন কম্পাউণ্ডারবাবু, হবে না কেন?

কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম, আজ আমার হাতে ব্যথা।

লোকটা খুব হাসল হেঁ-হেঁ করে। তারপর বলল, আজ্ঞে আপনার হাতে আর কী ব্যথা? সেই যে ইঞ্জেকশন ঠুকে দিলেন সেই থেকে আমার হাত ফুলে ঢোল। ব্যথার তাড়সে রাতে জ্বর এসে গেল। তবে বুঝলেন তাতে কাজটাও হল ভাল। কোমরের ব্যথা চড়চড় করে নেমে গেছে। বউকেও বললাম, ম্যাদামারা সব কম্পাউণ্ডাররা কী ইঞ্জেকশন দেয় তা ভগা জানে। ব্যথাও হয় না, কাজও হয় না। বড় ডাক্তারের পাশ করা কম্পাউণ্ডার একখানা এমন ঠুকল যে সর্বাঙ্গে যেন ঢেউ খেলে গেল। তা দিন ঠুকে আজও সেদিনের মতো।

আমি না না করতে লাগলাম। লোকটাও নাছোড়বান্দা। মাথা নেড়ে বলে, বড় ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার আপনি, ভিজিট কিন্তু বেশী তা জানি। আজ তাই আজ্ঞে তিনটে টাকা নিয়ে এসেছি। লোক তো আপনি হেটো-মেঠো নন! আমাদের সতীশ ঘোষকেও সেদিন ঠুকে দিয়ে এলেন দেখলাম।

অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

হেঁ-হেঁ, সব দিকেই নজর থাকে কিনা। তে-এঁটে রগচটা লোক আজ্ঞে।

আজকাল হাতে সবসময়ে কুড়ুল থাকে। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতে পারে না। যেমন-তেমন কম্পাউণ্ডার চৌকাঠ ডিঙোতেই সাহস পাবে না। আপনি বড়ো পেরেছেন।

আপনি জানলেন কী করে?

আজ্ঞে বড় রাস্তার ধারেই আমার দোকান কিনা। স্টেশনারি দোকান আজ্ঞে। চলে না। চারদিকে কী দোকান হচ্ছে বাপ। পায়ে পায়ে দোকান। বাহারও দিচ্ছে খুব। আমার দোকান তো ভেঙে ভেঙে খেয়েই বলতে গেলে শেষ অবস্থা। এখন একজন টেলারিং করবে বলে চাইছে, ভাড়া দেবে। তা ভাবছি দিয়েই দেবো। শরীরটাও আর দেয় না।

আপনি সতীশ ঘোষের পাড়ার লোক?

সাক্ষাৎ। সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ হয়। তবে কথা বলতে সাহস পাই না। আগে দিব্যি ন্যালাভোলা মানুষ ছিলেন। আজকাল মেজাজটা খুব তিরিক্ষে হয়েছে।

তিরিক্ষে হল কেন?

সে কারণ আছে। কোন এক ঠিকাদার ওঁর বাস্তুটা চাইছে। কী সব বড় বড় বাড়িঘর হবে। উনি তাই থেকে খাপ্পা।

আমি লোকটাকে ভিতরে ঢুকতে দিই। চেম্বার খুলে চেয়ারে বসাই। তারপর একটা সিরিঞ্জ বেছে নিয়ে স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞেস করি, আপনারা সব কি সতীশবাবুর পক্ষে?

আজ্ঞে না। পাড়ার ছোঁড়াগুলোকে অবশ্য বশ করে ফেলেছেন। সেগুলো এখন লাফাচ্ছে জলায় পার্ক হবে, খেলার মাঠ হবে, গুষ্টির পিণ্ডি হবে।

আপনারা পক্ষে নন কেন?

পুরোনো লোক তো আমরা। বাঙাল দেশের লোক নই। চার পুরুষে এইখানে বাস। আমরা সব জানি।

কী জানেন?

গড়াই বুড়ি তো ওই জমির শোকেই মরল কিনা। অনাথা বিধবা, একাবোকা মানুষ। চোখেও ভাল দেখত না। তাকে মা ডেকে তুতিয়ে পাতিয়ে জমিটা জলের দরে হাতিয়ে নিলেন কিনা। জমি বড় কমও নয়। চার বিঘের কাছাকাছি।

তারপর কী হল?

গড়াই বুড়ি থাকত জলার ঈশেন কোণটায়। এখনো ভিটেটা ঠাহর করলে দেখা যায়। জমি কিনে ঘোষমশাই এক থাবায় বুড়ির বাগানটাও অর্ধেক নিয়ে

নিলেন। কে কী বলবে বলুন! দেশ থেকে ক'ঘর ঠ্যাঙাড়ে এনে বসিয়েছিলেন। আমরা ভয়ে মুখ খুলতাম না।

তারপর?

বুড়ি রোজ শাপশাপান্ত করত। চোখের জল ফেলত। একদিন দেখা গেল ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে।

তাই নাকি?

গলাটা হঠাৎ একটু নামিয়ে লোকটা বলল, অনেকে অন্য কথাও বলে।

কী কথা?

লোকে বলে গড়াইবুড়ির গলায় আঙুলের দাগ ছিল।

বলেন কি?

বলবেই লোকে। বুড়ি মরার পরই তো তার বাস্তু জমিটা হাপিশ হয়ে গেল কিনা। একটা ডাকাত গোছের লোক এসে জেঁকে বসে গেল।

কোনো প্রমাণ আছে?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না। প্রমাণ কী থাকবে? থানা পুলিশ তো আর কেউ করেনি! কারই বা মাথাব্যথা বলুন। তবে সতীশ ঘোষ লোক খারাপ, একথা কেউ বলত না। ন্যালাভোলা লোক। মাস্টার মানুষ। সকলের সঙ্গেই বেশ মিলমিশ করে চলত। তা অসুখটা কী বুঝলেন আজ্ঞে?

কার অসুখ?

সতীশ ঘোষের, আর কার। সন্ধের মুখে দেখলুম বেশ বুক ফুলিয়ে সিঁধিয়ে যাচ্ছেন ঘোষমশাইয়ের বাড়িতে। তখনই বুঝলুম অবস্থা বেগতিক। এতবড় ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার সাহেবের যখন ডাক পড়েছে তখন অসুখটাও বেশ মহাশয়-মার্কাই হবে। না কি বলুন! তা কেমন বুঝলেন?

মাথার গণ্ডগোল।

সে আর বেশী কথা কী? মশাইয়ের হেড অফিস অনেকদিন ধরেই বিগড়ে বসে আছে। ওই ঠিকাদার এসে হুড়ো দেওয়ায় আরো একেবারে ফর্টিনাইন। সেদিন এক পাল গুণ্ডো গিয়ে হামলা করেছিল, তা দেখলুম কুড়ুল আপ্‌সে আপ্‌সে এমন চেঁচামেচি লাগালেন যে গুণ্ডোগুলো পালানোর পথ পায় না। হেড অফিস ওঁর অনেকদিন ধরেই গণ্ডগোল। আর কিছু টের পেলেন না?

একটু রহস্যময় হেসে বললাম, রোগ নিয়ে কথা না বলাই ভাল।

লোকটা ডান হাতের জামার হাতা গুটিয়ে বলল, আজ এই হাতে দিন আজ্ঞে। বাঁ দিকটা সেই থেকে এমন টাটিয়ে আছে।

আপনি সতীশবাবুর বিপক্ষে নাকি ?

বিপক্ষে ? ও বাবা ও কথা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়। আমি মশাই, কারোরই বিপক্ষে নই। বিপক্ষে যাওয়ার মুরোদই নেই। দু-চারটে কথা মুখ দিয়ে ফসকে বেরিয়ে গেছে বলে আবার কথাগুলো ধরবেন না যেন। আমারও মাথাটার ঠিক নেই কিনা।

সতীশ ঘোষকে এত ভয় কেন আপনার ?

ভয় নয় ঠিক। তবে পাড়ার ছোঁড়াগুলো বড্ড বশ মেনে গেছে তো!

শুধু ওদের ভয় ?

তা ভয় আজকাল ছোঁড়াদের কে না পায় বলুন। যেদিন গুণ্ডোগুলো গিয়েছিল সেদিন ছোঁড়াগুলো ছিল না। কোথায় যেন ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল পাড়া ঝেঁটিয়ে। থাকলে রক্তারক্তি কাণ্ড হত। তবে গেরো এখনো কাটেনি।

গেরো কিসের ?

ওই ছোঁড়াগুলোর কথা বলছি। তারা সব গুণ্ডোগুলোকে খুঁজছে। পেলে নাকি মেরে জলার পাঁকে পুঁতে ফেলবে। দিলেন নাকি ঠুকে ?···দেননি এখনো ? তা ভাল। যা বলছিলুম, এ জল কতদূর গড়ায় তার ঠিক কী ? পাড়ায় শান্তি নেই মশাই। হাতে প্রাণ নিয়ে বাস করছি। সবই ঘোষ মশাইয়ের আশীর্বাদ আর কি!

ঘোষমশাই বিদেয় হলে কি পাড়াটা জুড়োয় ?

তা জুড়োয় বোধহয়। হেঁঃ হেঁঃ, এ কথাটাও ফসকে বেরিয়ে গেল আজ্ঞে। ধরবেন না যেন।

ধরছি না। বলে যান।

ছুঁচটা বাগিয়ে ধরেছেন দেখছি। তা হয়ে যাক না। তারপর বলব, খন।

না, আগে বলে নিন।

কথাটা কি জানেন। গুণ্ডোগুলোকে সবাই চিনে রেখেছে। সর্দারটার নাম ট্যাপা। তার ওপরেই সকলের রাগ। আর চিনেই হয়েছে মুশকিল। লেগে গেল বলে।

পাড়ায় সতীশবাবুর এত খাতির হল কেন জানেন ?

খাতির! তা খাতিরই বলতে পারেন। খুব তেজালো লোক কিনা। লোকে ভাবে উনি গত জন্মে ছিলেন পরশুরাম।

বটে! সত্যিই ভাবে নাকি ?

তা ভাবতে দোষ কী ? গুহ্য কথা তো আর সবাই জানে না। গড়াইবুড়ি তো

আর ভূত হয়ে এসে নালিশ করবে না, ওগোঁ, আঁমার জঁমি সঁব গাঁপ কঁরেঁছে গোঁ, আঁমাঁকে গঁলা টিঁপে নিকেঁশ কঁরেঁছেঁ গোঁ···না কি বলেন ?

কিন্তু আপনারা তো সব জানেন! গড়াইবুড়ির হয়ে আপনারাও তো নালিশ করতে পারেন।

ও বাবা! আমাদের মুখে সব কুলুপ আঁটা। আপনাকে বলেই কথাগুলো হড়হড় করে বেরিয়ে গেল। ওসব ভাবাও পাপ। আমার কথা ততটা ধরা উচিতও নয়। দেবেন নাকি এবার ? আহা, সেদিন যা একখানা ঠুকলেন, আপনার সোনার ছুঁচ হোক।

সতীশ ঘোষের বাড়িতে কে কে আছে বলুন তো!

কে আর থাকবে। বড় ছেলেটা বজ্জাত, ছোটটা পাগল। এক মেয়ে বিয়ে ভেঙে কদিন বাপের ঘাড়ে বসে জিরেন নিয়ে আবার এক ছোঁড়ার সঙ্গে বে বসেছে। আর একটা কেলে মেয়ে আছে। বিয়ে হয়নি। সংসারে শান্তি নেই। ঘোষমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ির কারো বনে না।

বনে না কেন ?

বনবে কেনই বা বলুন! বাড়িটা তো একটা জঙ্গুলে কারবার করে রেখেছেন। ছেলেপুলেরা চায় বেচে বুচে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে বেশ চকচকে পাড়ায় বাড়ি তুলে গিয়ে থাকে। তা ঘোষমশাই তো সে কথা শুনলেই ক্ষেপে যান। শুধু পাগলা ছেলেটা ওঁর পক্ষে।

এবার দিচ্ছি, শক্ত হয়ে বসুন।

যে আজ্ঞে। একবার ইষ্টদেবকে স্মরণ করে নেবেন না ?

আপনি নিন।

এই নিই।···এবার দিন···

দিলাম। হাত তেমন কাঁপেনি আজ। রক্তটাও কম বেরোলো। লোকটা কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে জলভরা চোখ মুছে বলল, আজ একেবারে ঠেলার চোটে ওষুধ ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছে গেছে। আপনার হাত দুখানা সোনা দিয়ে বাঁধানোর মতো।

এবার পালান।

এই পালাই, তিনটে টাকা রাখুন। গরীব মানুষ, বোঝেনই তো!

লোকটা চলে যাওয়ার পর সিরিঞ্জ ধুতে ধুতে শঙ্কিত চোখে একবার দরজাটা দেখে নিলাম।

হাত কেঁপে সিরিঞ্জটা আবার ভাঙত। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললাম,

তুই ?

ছাপা একটা লাল ডগডগে আর সবুজ কটকটে শাড়ি পরা বুনি কোমরে হাত দিয়ে দরজায় দাঁড়ানো। চোখ দুটোয় অপলক দৃষ্টি। বলল, মরণ! কী করছিলে শুনি! খালি বাড়ি পেয়ে সব ওষুধবিসুদ পাচার করছ নাকি? হাতে ছুঁচ কেন?

তা দিয়ে তোর কী?

আমার কিছু নয় বুঝি? এ ঘর তুমি খুললেই বা কি করে?

অত তোকে জানতে হবে না।

জানি গো জানি। তোমার চেহারাটাই ভদ্রলোকের মতো। তাই তো বলি আমাকে দেখে খগেন সাঁপুই অমন দৌড়ে পালাল কেন। যেন দিনে-দুপুরে ভূত দেখেছে। ছ্যাঁচড়ার হাড় ওই লোকটাকে দিয়েই শেষ অবধি ওষুধ পাচার করতে লেগেছো নাকি? কবে থেকে জুটল ও?

তুই লোকটাকে চিনিস?

হাড়ে হাড়ে চিনি। আমি তো ওর দোকানের উল্টোদিকের বাড়িতেই কাজ করি।

কেঁপে উঠে বলি, কার বাড়ি?

বললেই কি তুমি চিনবে! ঘোষ মাস্টার।

সতীশ ঘোষ?

চেনো দেখছি।

এতদিন বলিসনি কেন?

কী বলব।

যে তুই সতীশবাবুর বাড়িও ঠিকে করিস!

বলার কী? এ আবার জনে জনে বলে বেড়ানোর মতো খবর নাকি? ঠিকে ঝিরা পাঁচ বাড়ি কাজ করে সবাই জানে।

বলা উচিত ছিল।

তোমারও তাহলে বলা উচিত ছিল যে, খগেন সাঁপুইয়ের সঙ্গে তোমার সাঁট আছে।

সাঁট আছে কে বলল?

তাহলে ও আসে কেন?

চেনা লোক বেড়াতে আসবে না?

ইঃ রে, বেড়াতে আসবে? খগেন বেড়াতে আসার লোক? মতলব ছাড়া এক পা চলে না। জিজ্ঞেস করে দেখো, গেল বছরের তিন হপ্তার মাইনে পাই কিনা।

যেমন ওটা বজ্জাত তেমনি বজ্জাত ওর মাগ। পুজোর মাসে খাটালে, একখানা ট্যানা অবধি দিলে না।

ওর বাড়িতেও কাজ করেছিস?

জানলে করত কোন শালী?

বুনি! অত চেঁচাস না।

কেন চেঁচাব না? কোন পীরিতের কথা হচ্ছে যে চুপি চুপি বলতে হবে? পাঁচজনে শুনছে বুনি। কিছু পাচার করিনি, বিশ্বাস কর।

তোমাকে বিশ্বাস! তার চেয়ে কেউটে সাপ ভাল।

বিশ্বাস কর, কালীর দিব্যি।

তাহলে কী করছিলে?

লোকটা গেঁয়ো, বলল, এত বড় ডাক্তারের চেম্বারখানা একটু দেখব বাবু, একটা পেন্নাম ঠুকে যাবো।

খগেন গেঁয়ো? না তুমি গেঁয়ো? ও অমন ভিজে বেড়ালের মতো থাকে। রগে রগে বুদ্ধি। তোমাকে এক হাটে সাতবার বেচতে পারে। ডাক্তারের ঘর দেখতে এয়েছে! হুঁ!

ওকে ইনজেকশন দেওয়ার কায়দাটা দেখাচ্ছিলাম।

দেখ কানুবাবু, মিথ্যে কথা বলারও কায়দা-কানুন আছে। আমি কলকাতায় চরা মেয়ে, বাবু বিবি চরিয়ে খাই। ঠিক কথাটা বল তো!

বুনি, প্লীজ···।

আচ্ছা ঠিক আছে বাপু, কিছু বলতে হবে না। যা করছিলে তা করছিলে। আমার তাতে কী? শুধু বলো একটা কিস দেবে!

কী?

কিস গো কিস। ইংরিজি বোঝো না? রোজ বাঁদর মার্কা মাজন দিয়ে দাঁত মাজি। এই দেখ কেমন ঝকঝকে দাঁত। মুখে গন্ধ নেই দেবে কিনা বলো!

ছিঃ বুনি! তোর না বিয়ে?

বিয়ে বটে, তবে যমের সঙ্গে। এসো তো বাপু, সাপটে ধরো। অনেকদিন ধরে ন্যাকড়াবাজি করে যাচ্ছো। এমন ডগমগে একটা মেয়েছেলে পেলে যে গরম হয় না সে আবার পুরুষ! এসো।

বুনি!

তাহলে গিন্নিমাকে বলে দেবো।

আচ্ছা। কিন্তু অল্প একটু। একবার। ঠিক আছে?

একবারই হোক তো ! এসো । অত ছুঁচিবায়ু কেন তোমার বলো তো ! এমন কিছু ভদ্দরলোক তুমি নও । নামে বামুন ।

আমার বুক কাঁপতে থাকে ভয়ে । মুখ শুকিয়ে যায় । বলি, বাইরের দরজাটা বন্ধ করেছিস বুনি ?

করেছি গো । এসো....

বন্য গন্ধ এবং অস্বাভাবিক এক উত্তাপ নিয়ে বুনি আমার ওপর একটা মস্ত ঢেউয়ের মতো এসে পড়ে । আমি সেই ধাক্কায় টলে যাই ।

বুনি, কাজটা ভাল হচ্ছে না ।

আঃ ! কাজের সময় কেন যে অত বকবক করো ! কিছু হয় না এতে বুঝলে ! কিছু হয় না । মানুষ পচে যায় না মেয়েছেলেকে আদর করলে ।

তোর সতীত্ব বলে কিছু নেই ?

খিলখিল করে হাসল বুনি । বলল, ছিল । বিয়ের আগে । খুব শিবপুজো করে বিয়ে হল একটা উদোর সঙ্গে । উদো বলে উদো । চাষ করতে মাঠে যেত আর ফিরতই না তিন চার দিন । কোথায় যেত, কেন যেত তা ভগা জানে । কথা বললে জবাব দিত না ! ঘরে জোয়ান শ্বশুর আর আমি । ভাবো ব্যাপারটা ! তা শ্বশুরই শেষে একদিন... ! খুব জোর একখানা লাথি ঝেড়েছিলাম । উল্টে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল ।

তোর বিয়ে হয়েছিল বুনি ?

সেই তেরো বছর বয়সে ।

বলিসনি তো !

সবই কি তোমাকে বলার কথা ছিল নাকি আমার ! কে আমার নাঙ্ রে । ঘোষ বাড়ি কাজ করি সে ওকে বলতে হবে । কবে বিয়ে হয়েছিল সেই খোতেন দিতে হবে । পীরিতের নাগর নাকি তুমি ?

বুনির ধারালো মজবুত দাঁত আমার ঠোঁটে বসে মাংস কেটে নিচ্ছিল । যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে গিয়েও পুরুষকারবলে চুপ করে থাকি । ওর মাথা থেকে সস্তা তেলের গন্ধ আসছে । উদ্ভট গন্ধ আসছে বাসন-মাজা হাত থেকে । ওর সর্বাঙ্গ থেকে আসছে ঐটোকাঁটার গন্ধও । যা বোধহয় সবটাই আমার পূর্ব ধারণাপ্রসূত কল্পনা । কারণ, বুনি খুব পরিষ্কার থাকে, বাসন মেজে সাবান দিয়ে হাত ধোয়, এবং সর্বদাই থাকে তার বাহারী সাজ । তবু আমি ভুল গন্ধ পেতে থাকি ।

বুনি ! ছাড় ।

ছাড়ব না । কী করবে ?

হয়েছে তো !

না । সবে শুরু । আজ তোমার সতীপনা ঘোচাবো । বুনিকে তো চেনো না !

আমি ছাড়া কি পুরুষ নেই বুনি ! তুই আর কাউকে চোখে দেখিস না ?

অনেক আছে । তারা তোমার মতো মেনিমুখো নয় । কিন্তু আমি জানতে চাই তোমার অত গুমোর কিসের ।

আমার কী সন্দেহ হয় জানিস ?

কী ?

সব বাড়িতেই তোর একজন করে আছে ।

ঝট্ করে বুনি ঠোঁট সরিয়ে নিল । তারপর আমার চোখের দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থেকে সাপিনীর মতো ফোঁস করে উঠল, বললে ! বললে ওকথা ! তোমার কি ধারণা আমি বেশ্যা ?

একটু ঢোঁক গিলে খগেন সাঁপুইয়ের পোঁ ধরে বলি, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, কথাটা ধরিসনি ।

তোমার মনে এত পাপ কানুবাবু ?

মাথা নেড়ে বলি, পাপ নয় রে, ভাবসাব দেখে মনে হয় তোর শরীরে বড় জ্বালা । যাদের অত জ্বালা থাকে তারা কি আর বাছবিচার করে ? নাকি একজনকে নিয়ে থাকলেই তাদের চলে ?

বুনি আমার বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, এতদিনে বুনিকে তুমি এই বুঝলে ! ছিঃ গো ছিঃ ! রাস্তায় ঘাটে ট্রেনে কত ছেলে-ছোকরা বুড়ো ধুড়ো অবধি আমার পিছু নেয় জানো ? কত ইশারা ইংগিত, কত রসের কথা, চোখ টেপাটেপি । ইচ্ছে করলে তোমার বুনির কি নাগরের অভাব ?

'তোমার বুনি' শুনে আমার হাত পা হিম হয়ে গেল । ওর দু হাতের ফাঁস ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বললাম, তুই ভাল মেয়ে বুনি । তবু যে কেন মাঝে মাঝে পাগলামী করিস !

বুনি আমাকে আরো জোরে চেপে ধরে বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, এমন করে যদি রোজ রোজ পায়ে ঠেল তাহলে তোমার বুনিকে একদিন ঠিক দেখো ষণ্ডা গুণ্ডা টেনে নিয়ে যাবে । নেওয়ার চেষ্টাও কি করে না নাকি ? ঘোষ মাস্টারের পাগল ছেলেটা আজও চিমটি কেটেছে ।

ঘোষ মাস্টারের ছেলে ? বলিস কি ?

বলব আবার কী ? আরো চোখ বুজে থাকো, তোমার বুনিকে শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে খাক । তাই তো চাও ।

কী করেছিল ছেলেটা ?

আজ নতুন নাকি ? রোজই ছুঁক ছুঁক করে। পুকুরঘাটে বাসন মাজছি, ঠিক কচুবনে ঘাপটি মেরে বসে চেয়ে থাকবে, ঘর ঝাঁটানোর সময় চৌকিতে বসে বুক দেখার চেষ্টা করবে, ঘুরঘুর করে বেড়াবে পিছনে পিছনে সারাক্ষণ। আজ যখন বাসন মাজছিলাম তখন—এঃ মাগো, বলতেও লজ্জা করে—

থাক বলিস না।

না, শোনো, তোমাকে বলব না তো কাকে বলব ? যখন বাসন মাজছিলাম তখন এসে কুটুস করে পিছনে চিমটি দিয়ে পালাল। ভাবতে পারো ? অত বড় দামড়া ছেলে...

কাজ ছেড়ে দে না।

আহা, কাজ ছাড়লেই যেন রেহাই আছে। সব বাড়িতেই আছে ওরকম।

সব বাড়ি কি আর একরকম রে বুনি।

সব বাড়িই চিনি গো, আর সব শালাকেও। গরীবগুরবো যুবতী মেয়ে দেখলে সব ব্যাটার নোলা সকসক করে। নাড়াঘাঁটা করতে ইচ্ছে যায়। সবার মুরোদ সমান নয় তো, তাই ইচ্ছে থাকলেও সবাই পেরে ওঠে না। কিন্তু তাদের চোখ মুখ কথা কয় গো বাবু !

মাস্টারের ছেলেটাকে একটা থাপ্পড় কষালেই পারতিস।

লাভ কী ? কাঁঠাল ভাঙলে মাছি ভ্যানভ্যান করবেই। কত তাড়াবে ? তা বলে বুনিকে সস্তা ভেবো না।

কখন ভাবলাম।

এই একটু আগেই ভাবছিলে।

মাস্টারের ছেলেটা কেমন পাগল রে বুনি ?

ওমা ! পাগল আবার কেমন ? তোমার বাপু অদ্ভুত সব কথা। পাগল সব একইরকম পাগল।

না, বলছিলাম পাগল হল কিসে ? কোনো মেয়েছেলের ব্যাপার-ট্যাপার নেই তো ! হয়তো কাউকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, পারেনি।

বুনি খিলখিল করে হেসে বলে, কাউকে কী গো ? সবাইকে।

তার মানে ?

সে পাগলা দুনিয়াশুদ্ধু মেয়েকে বে করতে চায়। একটা কোনো ছুঁড়ি দেখলেই হল দৌড়ে গিয়ে মাকে বলবে, মা ! মা ! আমি ওকে বিয়ে করব, ওকে বিয়ে করব। উদয়াস্ত বিয়ের কথা। সে যাকগে, মরুকগে। এখন তো আদর

করো।

বুনি, প্রথমদিন বেশী বাড়াবাড়ি করতে নেই। আজ ক্ষান্ত দে।

আর একটা কিস দাও। একটা ....মম্‌মম্‌মম্‌ ...

বুনির সঙ্গে ঠোঁটের খেলায় যখন জান লড়িয়ে দিচ্ছি তখন হঠাৎ কেমন যেন চোখে সব লাল দেখছিলাম। ঘরটার সাদাটে আলোয় কেমন মলিন ছায়া লাগল। তারপরই চমকে শিউরে তড়িতাহতের মতো তিন পা ছিটকে গেলাম। বুনি ভ্যাবাচ্যাকা।

দরজায় মলিন শাড়ি পরা আমার ক্ষয়াটে চেহারার বোনটা দাঁড়িয়ে আছে অবাক হয়ে। তার চোখে পৃথিবীর বিস্ময়। এত অবাক সে জীবনেও হয়নি বুঝি আর।

দরজাটা বন্ধ করিসনি বুনি ?

ভেজিয়ে রেখেছিলাম। মরণ ! এ কে গো ?

কুসুম কথা বলতে পারছিল না, চোখের পলক ফেলতে পারছিল না। বোধহয় শ্বাসও ফেলছিল না। ওর মুখটা করুণ ও অদ্ভুত। দু পক্ষের মধ্যবর্তী শূন্যতায় একটা তেজস্ক্রিয় বলয় গড়ে উঠছে। কে সেই বলয় প্রথম ভাঙবে সেটাই হল কথা।

ভাঙল বুনি। হঠাৎ ঝাঁঝালো তীব্র গলায় সে বলে উঠল, কে গো তুমি যাত্রার দলের সখি সেজে এসে দাঁড়িয়ে আছো ? বলা নেই কওয়া নেই হুট বলতেই ঢুকে পড়েছো যে বড় !

কুসুম দাবড়ানিকে বড় ভয় খায় না। তবে তার অবাক ভাবটা এতই গভীর যে সে একবার বুনির দিকে চেয়ে দেখল মাত্র। জবাব দিল না। আমার দিকে ফিরে বলল, ট্যাপাদা আমাকে পাঠাল।

গলার স্বরটা যে ফুটবে এমন আশা আমার ছিল না। কুসুমের দিকে চোখ তুলে কোনোদিন তাকাতে পারবো বলেও মনে হচ্ছিল না। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে। গলা খাকারি দিয়ে বললাম, কেন ?

বুনি চালাক মেয়ে। আমাদের সম্পর্কটা আন্দাজ করেই টুক করে কুসুমের পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওপরতলায় তার ঝাঁটার শব্দ পেলাম।

শব্দটা কুসুমও উৎকর্ণ হয়ে শুনল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, ও কে ? এ বাড়ির ঝি ?

জবাবে আমি যে-কথাটা বললাম তার কোনো মানেই হয় না। বললাম, ওই

আর কি, একরকম। বস্তুত আর কোনো কথাই এল না মাথায়।

চিমনি কে?

চিমনি!

ট্যাপাদা বলল, চিমনি নাকি এ বাড়িতে এসেছে। তাই ট্যাপাদা নিজে আসতে সাহস পাচ্ছে না। বজরঙ্গের দোকানের পাশে লুকিয়ে আছে।

ও আচ্ছা।

তোর সঙ্গে কী দরকার যেন। বাড়ি গিয়ে তাই আমাকে ডেকে আনল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না চিমনি কে।

আমি খুব অবাক হওয়ার ভাণ করে বলি, চিমনি! কই নামটা তেমন চেনা ঠেকছে না তো! ভুল শুনেছিস বোধহয়।

ভ্রূ কুঁচকে কুসুম বলল, ভুল! কি জানি, চিমনিই বলল বলে মনে হল। তবে ট্যাপাদা খুব ঘাবড়ে গেছে, হাউমাউ করে কথা বলছিল। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। চিমনিই যেন শুনলাম।

চিকু নয় তো! চিকুই হবে। আমাদের বন্ধু।

চিকুকে ট্যাপাদার ভয়ের কী?

আছে। সে তুই বুঝবি না।

কুসুম মাথা নাড়ল, না, চিকু নয়। আমি চিমনিকে না চেনায় খুব অবাক হয়ে বলল, চিমনিকে চিনিস না কী রে? তোদেরই মাসতুতো বোন!

আমি দ্বিতীয়বার পায়ের তলার জমি হারিয়ে ফেলে আবার একটা ধাঁধার মতো জবাব দিই, হবে কোথাও ছিল কখনো।

বলল, ও বাড়িতে চিমনি ঢুকেছে। আমি যেতে পারছি না। তুই গিয়ে কানুকে খবর দে।

ও। আচ্ছা।

ওই ঝি মেয়েটাই কি চিমনি?

ঝি! চিমনি! এই বলে আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

কুসুম তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ নীরবে আমাকে লক্ষ করে। তারপর বলে, আমি যাচ্ছি। ট্যাপাদাকে কী বলব?

তুই যা। আমি যাচ্ছি।

কুসুম আমার মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে চলে গেল।

বুনি বোধহয় ওপর থেকে কুসুমকে চলে যেতে দেখেই দৌড়ে নেমে এল, মেয়েটা কে গো? তোমার বোন?

হুঁ।

বড় বড় চোখ করে উৎকণ্ঠিত বুনি বলে, ছি, ছিঃ, এখন কী হবে?

তুই আমাকে ডোবালি বুনি!

বুনি আমার হাতদুটো ধরে বলল, মাইরি, আমার যে কলঙ্ক রটে যাবে গো! তোমারও।

তা রটবে।

একটা কাজ করবে?

কী কাজ?

চলো, আমরা বিয়ে বসে যাই।

হাত ছেড়ে দে বুনি।

ভয় পাচ্ছো কেন? এই অবস্থায় এ ছাড়া আর পথ কী বলো? কালীঘাটে দিনরাত বিয়ে হয়। না হয় তো রেজিস্টারি না কি বলে যেন, কাগজে সই দিয়ে সেই যে বিয়ে হয়, তাই সই। যাবে?

আমার কাজ আছে বুনি, ছাড়।

বুনির হাত ছাড়িয়ে আমি বেরিয়ে আসি। হাত পা এখনো আড়ষ্ট হয়ে আছে লজ্জায়। চোখ তুলে তাকাতে পারছি না কোনোদিকে।

বজরঙ্গের পান-বিড়ির ঘুমটি দোকানটা দুপুরে বন্ধ থাকে। দোকানটার আবডালে ট্যাপা দাঁড়িয়ে। চোটে রোদচশমা, মুখে উদ্বেগ। ট্যাপার চেহারাটা রোগার দিকেই। একটু শিরা-ওঠা কেঠো হাত পা। মুখের হনু উঁচু। গাল বসা। ঘাড় অবধি চুল নেমে এসেছে। গায়ে একটা কটকটে লাল সোয়েটার। পরনে নীল রংচটা জিনস্। পায়ে চপ্পল। একটা সবুজ ডায়ালের দামী সিকো ঘড়ি বাঁ কব্জিতে ঢিলা ব্যাণ্ডে ঝুলে আছে।

দোস্ত!

কী চাস ট্যাপা?

ফের চিমনি ইন করেছে! ব্যাপারটা কী?

তুই চিমনিকে স্বপ্ন দেখছিস।

তবে এই মেয়েছেলেটা কে? ছাপা শাড়ি পরা? একটু আগে ঢুকল?

চিমনি নয়।

আমি কি চিমনিকে চিনি না দোস্ত?

তুই সব মেয়েকেই আজকাল চিমনি দেখিস।

ঢপ দিও না দোস্ত! চিমনিকে তুমি আজকাল ঘনঘন ইমপোর্ট করছ। আমি

তো শালা তোমার জন্য জান লড়িয়ে যাচ্ছি। তবু চিমনিকে ইমপোর্ট করছ কেন ?

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম, তোর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে।

বাজে বোকো না ! তুমিই তো সেদিন বললে, আমার এডুকেশন নেই, আরও সব কী কী নেই।

বলেছিলাম তো কী ? মেয়েদের মতির কোনো ঠিক আছে ? সবাইকে ছেড়ে হয়তো সবচেয়ে বুরবাকটার গলায় গিয়ে ঝোলে।

আমি কি শালা বুরবাক ?

তা বলছি না।

চিমনিকে কী বলেছো আমার কথা ?

সব বলেছি।

কী বলল ?

খুব হাসল।

হাসল ? হাসির কী আছে ?

খুশিই হল বোধহয়।

দিল্লাগী কোরো না দোস্ত। আমার প্রেস্টিজ বলে কথা আছে। ওকে বোলো, আমার নামে দুটো মার্ডার চার্জ আছে। কিশোরের মতো গলা ...

ওসব বলা হয়ে গেছে।

চেহারাটা বিনোদ খান্না ...

বলেছি।

চিমনির কি আমাকে মনে আছে দোস্ত ?

আরে না, তোর ভয় নেই। চিমনি প্রায়ই রাস্তায় ঘাটে একজন দুজনকে ধরে পেটায় ?

দুজনকে একা !

ট্রেনে গয়া থেকে ফিরছিল। মাঝরাতে ডাকাত ওঠে। চিমনি চারটেকে দু মিনিটে সাফ করে দেয়। বাকি তিনজন চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। খবরের কাগজে পড়িসনি ?

রোদচশমার ভিতর দিয়ে অপলক চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ট্যাপা একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, বহোৎ রুস্তম মেয়েছেলে।

তা তো বটেই। নইলে তোকে ওরকম ...

পুরনো বাত ছোড়ো ইয়ার। যো হো গিয়া সো হো গিয়া। ঘরের মেয়েছেলের

অত রুস্তম হওয়া ভাল নয় দোস্ত।

তা বটে।

ট্যাপা কিছুক্ষণ নিজের ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলল, দোস্ত, কিছু মনে কোরো না। একটা প্রবলেম হয়েছে।

কিসের প্রবলেম ?

কাল সকালে একটা কেলো হয়ে গেছে।

কিসের কেলো ?

ট্যাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কেস ঢিলা। ট্যাপা পুরো খরচা হয়ে গেছে দোস্ত।

তার মানে কি ট্যাপা ?

কাল সকালবেলায় যখন ঘুমোচ্ছিলাম মা এসে ঠেলে তুলে দিল বিছানা থেকে। বলল, তোর সঙ্গে একটা মেয়ে দেখা করতে এসেছে, শিগগির যা, খুব কাঁদছে মেয়েটা। শুনে এমন ক্যালাস হয়ে গেলাম যে কিছুক্ষণ মাথাটা ভোম হয়ে রইল। আমার কাছে মেয়েছেলে, তাও আবার টিয়ারগ্যাস নিয়ে ! গিয়ে দেখি একটা কালো মতো মেয়ে বারান্দায় রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরে বসে আছে। আমি মেয়েছেলেদের সঙ্গে তেমন ডায়ালগ দিতে পারি না। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটা চোখ তুলে কিছুক্ষণ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল আমার দিকে। শোলে-র জয়া ভাদুড়ির চোখ মাইরি। কী ইনোসেন্ট !

মেয়েটা কে ?

ট্যাপা আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে মেয়েটা উঠে পড়ল। বলল, চলুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। প্রাইভেট। বাড়ির লোকেরা উঁকি ঝুঁকি মারছিল, তাই আমরা গুল কারখানার ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মেয়েটা বলল, আপনি সেদিন আমার বাবাকে ওরকম অপমান করলেন কেন ? আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনার বাবা কে ? কী বলল জানো দোস্ত ? বলল, আমি সতীশ ঘোষের ছোটো মেয়ে ময়না।

অবাক হয়ে বলি, সতীশ ঘোষের মেয়ে ?

শুনে আমি একটু ব্যোমকে গেলাম। বললাম, আপনার বাবা কেসটা খুব খারাপ করছে, জমিটা ছেড়ে দিলেই কিচান স্টপ হয়ে যাবে। মেয়েটা আমার দিকে তেমনি জয়া ভাদুড়ির মতো চেয়ে রইল। তারপর হল আরো কেলো। সেই চোখ থেকে মাইরি ছোটো ছোটো আঙুরের মতো জল টপ টপ করে পড়তে লাগল। দেখে দিলটা কেমন যেন করে উঠল দোস্ত। এসব সিন অনেক দেখেছি

সিনেমায়। সামনা সামনি প্রথম দেখে ...

বুঝেছি। তারপর বল।

কী আর বলার আছে দোস্ত। মেয়েটা কিছুক্ষণ ওইরকম জয়া ভাদুড়ির মতো পোজ দিয়ে বলল, আমার বাবা পাগল। কিন্তু সবাই জানে বাবা একটা আদর্শের জন্য লড়াই করছে। মরে গেলেও বাবা ওই জমি ছাড়বে না। আর তাই আমরা সবাই বাবার জন্য ভীষণ ভয়ে ভয়ে থাকি। কন্ট্রাকটরের অনেক ক্ষমতা, অনেক টাকা। কন্ট্রাকটর যে আপনাকে লাগিয়েছে তা আমি জানি। পাড়ার ছেলেরা, পার্টির লিডাররা আপনাকে খুঁজছে, পেলে জলার পাঁকে পুঁতে ফেলবে। কিন্তু আমি জানি বাবাকে ওভাবে বাঁচানো যাবে না। বাবা একা একা মর্ণিং ওয়াক করতে যান, বাজার হাট করেন, রেশন তোলেন। রাস্তায় ঘাটে তাকে তো প্রোটেকশন দেওয়ার কেউ নেই। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার বাবাকে মারবেন না। পায়ে পড়ি, মারবেন না ...

তুই কী বললি ?

কী বলব দোস্ত ? মেয়েছেলের সঙ্গে ডায়ালগ আমার আসে না। তবু বললাম, জমি নিয়েই যখন কিচান তখন কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে ভাল রকম খিচে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন ? মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, আমরা তো অরাজী নই। কিন্তু বাবা কারো কথা শুনবে না। বলে লাভ নেই। একটা পাগল লোক একটুকরো জমি বুকে আঁকড়ে ক'টা দিন পড়ে আছে, থাক না। আমি শুধু ওঁর প্রাণটা আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি। আমার কিছু গয়না আছে। সামান্য দেড় ভরি মাত্র। আমি নিয়ে এসেছি। আপনি রাখুন। একথা শুনে আমার প্রেস্টিজে লেগে গেল। বললুম, দেখুন মিস, ছেলে আমি ভাল নই ঠিকই, কিন্তু বাপ ভদ্রলোক। ওসব গয়না-ফয়না আপনি নিয়ে যান। তখন মেয়েটা ভারী করুণ মুখ করে বলল, কিন্তু আমার যে আর কিছুই নেই যে আপনাকে দেবো। বুঝলে, দোস্ত, সেই জয়ার মতো চোখে সেই আঙুরদানা জল আবার টলটল করছিল। কাঁদতেও জানে মেয়েটা একদম আর্ট। আমার তো শালা নেশা ধরে যাচ্ছিল। বললাম, ওসব লাগবে না। তখন মেয়েটা বলল, তাহলে কথা দিন, আমার বাবাকে কিছু করবেন না।

কথা দিলি নাকি ?

দিতে হল দোস্ত।

এত সহজে মজে গেলি ট্যাপা ! তুই তো এরকম ছিলি না !

চোখ দুখানা তুমি তো দেখনি !

চোখ ধুয়ে জল খাবি নাকি ? সতীশবাবুর ছোটো মেয়ে কালো আর কুচ্ছিৎ বলে বিয়ে হচ্ছে না, সবাই বলে।

হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে ট্যাপা, কোন শালা বলে ? জবান খিচে নেবো না শালার।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারা হয়তো ভুলই বলে। কিন্তু তুই তা বলে এত সহজে গলে যাবি ট্যাপা ? তাহলে চিমনির কী হবে ?

চিমনি ! চিমনির সঙ্গে ময়নার তো কোনো লড়ালড়ি নেই !

এখন যে একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে রে ট্যাপা।

ট্যাপা খুব অদ্ভুত একরকমের হাসল। শুকনো হাসি। প্রাণ নেই। বলল, তুমি কি ভাবছো মোহব্বৎ ? আরে না। তবে চোখ দুটো ...

বুঝেছি। জয়া ভাদুড়ির মতো তো ?

একদম।

পুপুর সঙ্গে যে কথা অনেকদূর এগিয়ে গেছে ট্যাপা।

ট্যাপা মাথা নেড়ে বলল, সেই জন্যই তোমার কাছে দুপুরবেলা এসেছিলাম। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড দোস্ত। আমার দ্বারা হবে না। তুমি অন্য কাউকে লাগাও।

একটু ভেবে দেখ ট্যাপা।

ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড।

ট্যাপা !

ট্যাপা মাথা নাড়ল, ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড।

॥ পাঁচ ॥

জিমের চোখে এখন শুধু ঘৃণা। আজকাল সে কম ডাকে। তার লাফালাফি কমে এসেছে। দুটো থাবার মধ্যে মুখ রেখে আজকাল সে প্রায়ই ঝিমোয়। আগন্তুক এলে একবার বা দুবার অভ্যাসবশে ডাকে। তাও খোনা সুরে। তারপর ঝিমিয়ে পড়ে। তার গলার আওয়াজে আজকাল খোনা সুর এসে গেছে, আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। তার চারদিকে পড়ে আছে ছোটো ছোটো রঙীন মাছ। পড়ে থেকে পচে যাচ্ছে। শিকলে বাঁধা জিম মাঝে মাঝে মাছগুলোর দিকে নিস্পৃহভাবে চেয়ে দেখে, থাবা দিয়ে এদিকে ওদিকে সরিয়ে দেয়। এছাড়া তার আর কীই বা করার আছে ? ওর ও আমার মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিস্ফোরক সম্পর্কের বলয় গড়ে উঠছে, একদিন কি তা ফাটবে ? উদ্যত থাবায় এবং দাঁতে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে কি ?

জিম !

জিম চোখ তুলে চায়। তার হ্যা-হ্যা করা মুখ থেকে ল্যা-ল্যা করা জিবটা ফুটখানেক ঝুলে পড়ে। সে হাঁফায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। আমি লক্ষ করি প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে ওর একটু কষ্ট হচ্ছে। পা হড়কে গেল দুবার। এরকমই হওয়ার কথা। জিম গত তিন দিন কিছুই খায়নি। আমিই খেতে দিইনি ওকে।

জিম আমার মুখের দিকে চাইল। জিব বেয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা নাল পড়ল মেঝেয়। আমার হাতে ধরা অ্যাঞ্জেল মাছটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর আমার মুখের দিকে। কী বিপুল ঘৃণা ওর চোখে ! তবু বিদ্রোহ নেই। বরঞ্চ সৌজন্য বোধ ও বশ্যতায় মাথা নত করে নিল।

দুবার ওর নাকের সামনে মাছটা দোলালাম। এখনো মাছটার শরীরে স্পন্দন রয়েছে। এইমাত্র অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে জ্যান্ত মাছটা ধরে আনলাম।

খা, জিম, খা। বলে ছুঁড়ে দিলাম মাছটা।

জিম একবার শুঁকে দেখল। তারপর মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। সেই চোখে বিস্ময়, সেই চোখে প্রশ্ন, সেই চোখে ঘৃণা। ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে। থাবার মধ্যে মুখ গুঁজে মৃদু একটা গোঁ শব্দ করল মাত্র।

জিম ভাঙছে, তবু মচকাচ্ছে না।

কিন্তু আমি জানি, একদিন মচকাবে। আজ নয় তো কাল। জিমের সঙ্গে আমার এ লড়াই একদিন শেষ হবে। আমি জানি জিম জিতবে না। বশংবদ জিম কি তা বুঝতে পারছে না ?

হেরে যা জিম, হেরে যা। এই আমাকে দেখ জিম, খিদের চোটে আমরা সবই খেয়েছি। খোলাশুদ্ধ চীনে বাদাম, রেললাইন থেকে কুড়ানো পচা গম, বিয়েবাড়ির উচ্ছিষ্ট। ঘুগনীওয়ালার আশেপাশে রাস্তায় পড়ে থাকত লোকের ফেলে-দেওয়া শালপাতার ঠোঙা, কতদিন সেইসব ঠোঙা কুড়িয়ে চেটেছি অমৃতের মতো ! মানুষ এত হেরে যেতে পারে আর তুই হারবি না ? এ কি হয় ? সিন্নী খেয়ে মরে গিয়েছিল আমার দিদি। আমরা যত অখাদ্য খেতাম তাতে যে-কোনোদিন যে-কেউ মরে যেতে পারতাম। একবার একটুখানি হেরে যা জিম। একটা রঙিন মাছ একটুখানি মুখে তোল। আমি তোকে ফের মাংসের ছাঁট আর হাড় মিশিয়ে ভিটামিন গুলে গমের খিচুড়ি দেবো। একবার জিম—

খুব মৃদু লয়ে একটু লেজ নাড়ে জিম। তারপর ডুবে যায় অমোঘ ঝিমুনিতে। মুখ থেকে মাত্র এক ফুট দূরে অ্যাঞ্জেল মাছটা পড়ে আছে। পচবে। কাঁটাসার

হয়ে যাবে। জিম খাবে না।

জিমের অদূরে আমি চেয়ার পেতে বসে থাকি। রাত বাড়তে থাকে। লক্ষ করি প্রজ্ঞা, দৃঢ়চিত্ততা, লাভ করতে থাকি জ্ঞান। আমার কাছ থেকে জিম কিছু শেখে নাকি ? বোধহয় শেখে। শেখে কাকে বলে লোভ, কাকে বলে বিশ্বাসঘাতকতা, শেখে চৌর্যবৃত্তি, চরিত্রহীনতা।

জিম !

লেজ নড়ে ওঠে।

আমি শেষ অবধি দেখব জিম।

রাত বারোটায় ঘুঙুরের মতো ফোন বেজে ওঠে।

আমি যাজ্ঞসেনী। আপনি কি ঘুমোচ্ছিলেন ?

না যাজ্ঞসেনী।

কী করছিলেন ?

জ্ঞানলাভ করছিলাম।

বই পড়ছিলেন বুঝি ? আমিও। কিন্তু কিছুতেই কনসেনট্রেট করতে পারছি না। ঘুমও আসছে না।

কেন যাজ্ঞসেনী ?

বাবা সেই যে দিল্লি গেল, আর ফিরল না।

ফিরবেন যাজ্ঞসেনী। সবাই ফেরে।

কিছু জানেন না। বাবা ফিরবে না।

কেন ?

একটা দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনটাকে মথিত করে দিল। যাজ্ঞেসেনীর গলাটা শোনাল ভারী ও বিষণ্ণ, বাবা আসেনি, তার বদলে মার নামে এসেছে একটা ডিভোর্সের নোটিশ।

ডিভোর্স ?

হ্যাঁ মশাই, বিয়ের পঁচিশ বছর পর। আমরা সিলভার জুবিলি করব বলে সব ঠিকঠাক। ভেস্তে গেল।

কেন যাজ্ঞসেনী ? আপনি না বলেছিলেন পঁচিশ বছর আপনার মা আর বাবার মধ্যে কখনো ঝগড়া হয়নি ?

সে তো ঠিক কথা। পঁচিশ বছরের মধ্যে আমার তামিল বাবা আর বাঙালী মায়ের মধ্যে একদিনও এক বারের জন্যও ঝগড়া হয়নি। প্রথম হল আমাকে নিয়ে ওই তিনটে বইয়ের জন্য। তারপর এখন দেখুন কেমন আংসাং হয়ে

গেল।

উহুঁ, এখানে অঙ্কটা কথাটা হবে না যাজ্ঞসেনী।

তাহলে কী হবে? কেলো? কেরাসিন?

না যাজ্ঞেসেনী, এ হল কিচান। সে কথা থাক, কিন্তু আমি অংকটা মেলাতে পারছি না।

কোন অঙ্ক? মা আর বাবার কিচান তো! অঙ্কটা মেলাতে গিয়ে আমিও মেলাংকলিয়ায় ভুগছি। সঙ্গে ইনসমনিয়া। পঁচিশ বছর ধরে ঝগড়া না করেও পাশাপাশি থেকে ওরা বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। আমরা গিনেস বুক অফ ওয়ার্লড রেকর্ডে চিঠি দিয়েছি। নেকসট এডিশানে ওরা হয়তো এটাকে বিশ্ব রেকর্ড বলে ছেপেও দেবে। এদিকে কী কেলেঙ্কারি হয়ে গেল বলুন তো! মিলিটাকে পেলে আমি খুন করতাম।

আমার কী মনে হয় জানেন যাজ্ঞসেনী? পঁচিশ বছর ধরে ওঁদের যত ঝগড়া মুলতুবি ছিল, যত ঝগড়া হওয়া উচিত ছিল অথচ হয়নি, সেইসব বকেয়া একেবারে উসুল হয়ে গেল। মাঝে মাঝে একটু-আধটু ঝগড়া হলে অল্প অল্প করে উসুল হয়ে যেত। এরকম বিস্ফোরণ ঘটত না। কোনো কোনো বিশ্ব রেকর্ড মানুষের না করাই ভাল।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল টেলিফোনে। যাজ্ঞসেনী বলল, ইউ আর এ ওয়াইজ ম্যান। কিন্তু আমি কি করব বলুন তো! ঘুম আসছে না। কেবল কান্না পাচ্ছে।

গান শুনুন, মহাভারত পড়ুন, যোগাসন করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হবে না। কিছুতেই হবে না। বাবা ছিল আমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড। বাবা না থাকায় আমার আর কোনো প্রোটেকশন নেই। মা আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ির সবাই এমন ব্যবহার করছে যেন আমি অচ্ছুৎ, বিষকন্যা বা ডাইনী। আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে অবশ্য! আমার জন্যই তো এই সর্বনাশ।

আপনি নিমিত্ত মাত্র যাজ্ঞসেনী।

আপনি কি গীতা কোট করছেন?

করছি যাজ্ঞসেনী। পঁচিশ বছরে ঝগড়াহীন দাম্পত্যজীবন এমনিতেই ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয়ে আসছিল। আপনি জানেন না যাজ্ঞসেনী, একটু-আধটু ঝগড়া, মান ও অভিমান দাম্পত্যজীবনের ভিটামিন, অকসিজেন, কোরামিন। বিয়ে আর দাম্পত্য তো এক জিনিস নয় যাজ্ঞসেনী। আপনার মা ও বাবার বিবাহিত জীবন ছিল। দাম্পত্য ছিল না।

বলছেন?

বলছি।

ইউ আর এ ওয়াইজ ম্যান।

ধন্যবাদ যাজ্ঞসেনী।

মিলিটা বোকা, তাই আপনাকে পাত্তা দিল না। দিলে বর্তে যেত।

আমি বড় হতভাগ্য যাজ্ঞসেনী।

আমিও বড় হতভাগিনী সুবীর। আজকাল রোজ মরার কথা ভাবি। বাবা একটা টুকটুকে লাল ফিয়াট কিনে দিয়েছিল আমায়। আজকাল যখন-তখন সেটা নিয়ে পাগলের মতো বেরিয়ে পড়ি। এমন কি মাঝরাতেও। এখন তো আমার ওপর কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। কেউ বারণ করে না, বাধা দেয় না। একা একা গাড়ি নিয়ে চেনা অচেনা রাস্তা ধরে কত দূরে দূরে চলে যাই। মাঝে মাঝে পাতাল রেলের খাদের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় কী মনে হয় জানো? স্টিয়ারিংটা একটু ঘুরিয়ে দিই না, তাহলে অতল খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ব! সব শান্তি।

ছিঃ যাজ্ঞসেনী।

কতবার ইচ্ছে হয় খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে দেয়ালে ক্র্যাশ করি। এত ভীষণ ইচ্ছে হয় যে হাত পা নিশপিশ করতে থাকে।

আত্মহত্যা করলে কী হয় জানেন?

আপনি করে নয় সুবীর। তুমি।

তুমি কি জানো যাজ্ঞসেনী?

না সুবীর। বলো।

যে আত্মহত্যা করে তার আত্মা চিরকাল অন্ধকার সব গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ায়।

ইউ মীন উইদাউট স্পেস স্যুট অর অকসিজেন অ্যাণ্ড আদার থিংস আমি গ্রহান্তরে চলে যেতে পারব?

আরে না। আমি আত্মার কথা বলছি যাজ্ঞসেনী।

আমি যে আত্মা মানি না।

আমিও মানি না, তবে শাস্ত্রে বলে।

বাট ইট ইজ এ গুড প্রসপেক্ট সুবীর। অন্ধকার গ্রহে ঘুরে বেড়াতে আমার কিছু খারাপ লাগবে না। ইন ফ্যাক্ট আজকাল আলোর চেয়ে অন্ধকারই আমার বেশী ভাল লাগে।

তুমি কত সহজে মরার কথা ভাবতে পারো যাজ্ঞসেনী। আমি পারি না। আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দিনরাত চিন্তা ছিল এই প্রতিকূল পৃথিবীতে এত

শত্রু, এত অ্যান্টিফোর্সের মাঝখানে কী করে বেঁচে থাকা যায়! সুখ দুঃখ কিছু বোধ করতাম না কোনোদিন, শীত গ্রীষ্ম গায়ে লাগত না, শুধু বেঁচে থাকতে ভাল লাগত। রোজ ভোরবেলায় উঠে মনে হত, একটা দিন তো বেঁচে থাকা গেল, আর একটা দিনও কি যাবে না?

তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছো সুবীর।

না যাজ্ঞসেনী।

আমি কার জন্য বেঁচে থাকবো সুবীর? বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার যে আর কেউ নেই! বড্ড একা। বড্ড ভয়।

কিসের ভয় যাজ্ঞসেনী?

কি জানি কিসের ভয়। আমার ভূতের ভয় নেই, আরশোলার ভয় নেই, চোরের ভয় নেই, গুণ্ডা-বদমাশের ভয় নেই। তবু যে কিসের ভয় তা বুঝতে পারছি না। সারাদিন শুধু চমকে চমকে উঠি।

পাতাল রেলের খাদের ধারে আর যেও না যাজ্ঞসেনী। কোনো দেয়ালের দিকেও আর তাকিও না।

যাজ্ঞসেনী হাসল। বলল, আমার জন্য ভাবছো? ভাবতেও ভাল লাগে। তবু তো একজন ভাবছে। ভেবো না সুবীর, পাতাল রেলের খাদে বা দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে আমার মরতে ইচ্ছে হয় না। মা গো! মুখ থেঁতলে যাবে, হাত পা ভাঙবে, শরীরটা হয়ে যাবে রক্তমাংসের পিণ্ড। কী বিচ্ছিরি দেখাবে আমাকে বলো তো! আর যদি বাই চান্স না মরি তাহলে চিরকাল খোঁড়া, নুলো বা কানা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

ঠিক তাই যাজ্ঞসেনী, ওটা করো না।

সুবীর আমাকে একটা দয়া করবে?

দয়া! কী যে বলো যাজ্ঞসেনী!

মিলিদের বাড়িতে অনেক স্লিপিং পিল আছে, আমি জানি। তুমি সেদিন রত্না মাসীর জন্য দিতে চেয়েছিলে।

আছে যাজ্ঞসেনী।

দেবে আমাকে? কাউকে বলব না। শুধু তুমি জানবে আর আমি।

পাগল! তোমার কত সুখের জীবন! এ জীবন ছেড়ে যেতে চায় কোন বুরবক?

প্লীজ সুবীর।

না যাজ্ঞসেনী। একশোবার না।

দেবে না?

না যাজ্ঞসেনী, কোনো যুবতীর মৃত্যু আমি সইতে পারি না।

আজ পর্যন্ত কোনো যুবক আমার চোখের দিকে চেয়ে কোনো প্রস্তাবেই না বলতে পারেনি তা জানো?

আমি বলছি।

না। তুমি আমার চোখের দিকে চেয়ে বলছ না।

সে কথা অবশ্য ঠিক।

আমি দেখতে চাই আমার চোখের দিকে চেয়ে তুমি কী করে না বলো! আমি তোমার কাছে আসছি সুবীর।

আমি আর্তনাদ করে উঠি, এত রাতে! তুমি কি পাগল যাজ্ঞসেনী?

আমার তো বাধা নেই সুবীর। আমার দিন নেই, রাত নেই, ভাল নেই, মন্দ নেই। আমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারি, যখন খুশি, যার সঙ্গে খুশি। কেউ কিছু বলবে না।

প্লীজ যাজ্ঞসেনী।

ভয় পেও না সুবীর, আমাকে তোমার ভয় কি? একা ঘরে একজন যুবতীকে একজন যুবকের যে ভয় এ তো তা নয়। আমি তো মরেই আছি, মড়ার কি কমপ্লেক্স থাকে?

আমি স্লিপিং পিল দিতে পারব না যাজ্ঞসেনী। ক্ষমা করো।

এবার আমি গীতা কোট করছি সুবীর। তুমি নিমিত্ত মাত্র।

যাজ্ঞসেনী ফোন রেখে দেয়।

আমি অন্ধকার ঘরে বসে আলোকিত অ্যাকুয়ারিয়ামের দিকে চেয়ে থাকি। রঙিন মাছেরা ঘুরছে, ফিরছে, উঠছে, নামছে। কোনো উদ্বেগ নেই। শব্দহীন এক শান্ত জগৎ। মস্তিষ্কহীন, বোধহীন, আত্মীয়তাহীন এক অদ্ভুত জীবন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকি। কখন শরীর ছেড়ে ধীরে ধীরে আমি অ্যাকুয়ারিয়ামের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তারপর ছোট্ট ঢাকনাটা খুলে টুপ করে নেমে যাই জলে। শ্যাওলা, নুড়িপাথর, জলজ উদ্ভিদের ভিতরে সাঁতার কাটতে থাকে আমার হৃদয়। মুখে মুখ ঘষে দিয়ে যায় সোনালী মাছ। রামধনুরঙা একটি মাছ আহ্লাদে পাশাপাশি ভেসে থাকে কিছুক্ষণ। কত কথা হয় তার সঙ্গে। ভাষা নেই, উচ্চারণ নেই, ধ্বনি নেই, তবু ঠিকই কথা হতে থাকে। সে বলে, এই জলের খাঁচায় বেশ আছি হে। আমাদের আত্মহত্যা নেই, প্রেম নেই, বিচ্ছেদ নেই। আমরা জীবন-মৃত্যুর কোনো রহস্যই জানি না। পৃথিবী গোল, আকাশ

নীল, গাছপালা সবুজ, এ সব কিছুই জানা নেই। আমাদের অপরাধ নেই, অপরাধবোধ নেই। বেশ আছি হে জলের খাঁচায়। আত্মমুগ্ধ, প্রতিক্রিয়াহীন।

গাড়ির শব্দ। কলিং বেল। জিমের খোনা স্বরে একবার মাত্র ডাক, ঘ্রাউ।

জলের অতল থেকে আমি উপরে ধীরে জেগে উঠি। আলো জ্বালি। নিচে নামি! সদর দরজা খুলে দিই।

এক ঝলক নীল আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে। এত নীল! শাড়ি ব্লাউজ থেকে নখের পালিশ, কপালের টিপ থেকে চপ্পলের স্ট্র্যাপ, দুল থেকে গলার মালা, এমন কি লিপস্টিক অবধি নীলে নীল। একটু রোগা হয়ে গেছে কি যাজ্ঞসেনী? তবু কী সুন্দর!

জয় হোক যাজ্ঞসেনী।

আমার দিকে তাকাও সুবীর।

আমি চেয়েই আছি যাজ্ঞসেনী। চোখ ফেরাতে পারছি না।

আমার চোখের দিকে তাকাও সুবীর।

তোমার চোখ সুন্দর, টানা টানা, গভীর এবং নীল।

কমপ্লিমেন্ট চাইছি না সুবীর। আমি তোমাকে হিপনোটাইজড করতে চাইছি।

আমি সম্মোহিত যাজ্ঞসেনী।

তুমি হোপলেস সুবীর।

পরস্পরের দিকে আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকি। যাজ্ঞসেনী তার সুন্দর দীর্ঘ ও এলায়িত হাতখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, দাও।

তুমি থার্ড ইয়ার মেডিকেলের ছাত্রী যাজ্ঞসেনী।

তাতে কি?

তোমার স্লিপিং পিলের অভাব থাকার কথা নয়।

তুমি এখনও সম্মোহিত হওনি সুবীর। তোমার বোধ বুদ্ধি কাজ করছে।

রহস্যটা কী যাজ্ঞসেনী?

যাজ্ঞসেনী একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, প্রশ্ন করো না। দাও। আমি মেডিকেলের ছাত্রী নই।

তবে?

তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য বলেছিলাম। দাও, দেরী করো না।

এত তাড়া কিসের যাজ্ঞসেনী?

আমার সময় নেই সুবীর। ভোর হওয়ার আগেই আমাকে কোনো সমুদ্র বা নদীর ধারে পৌঁছতে হবে। যেখানে অনেক গাছপালা আছে, পাখি ডাকে, মাটির

সোঁদা-সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়, বুনো ফুল ফোটে...

বুঝেছি বুঝেছি। নেচার।

একজ্যাকটলি। এই মেকানিক্যাল প্রেমহীন মমতাহীন শহরে আত্মহত্যা করেও তো সুখ নেই।

তারপর?

ভোরবেলা যখন চারদিক একটু একটু করে ফর্সা হয়ে আসবে, পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়বে, ঘুরবে, ডাকবে, খুব পরিষ্কার বীজাণুহীন বাতাস বইবে, একটু কুয়াশায় ভিজে থাকবে চারদিক, আধফোটা কুঁড়ি পাপড়ি ছড়াতে থাকবে গাছে গাছে তখন...

বুঝেছি যাজ্ঞসেনী। চারদিকে জীবনের কনট্রাস্ট।

বড্ড ডিস্টার্ব করো তুমি। হ্যাঁ, যখন চারদিকে সবাই জাগছে, বেঁচে উঠছে, ফুটে উঠছে, রহস্যে ঘিরে আছে চারদিক, তখন গাড়ির সীটে হাঁটু মুড়ে ঘুমিয়ে পড়ব আমি।

বুঝেছি। দি স্যুইসাইড অফ দি ডিকেড। দারুণ!

ঠাট্টা! এখনো ঠাট্টা করতে পারছো! মাই গড, ইউ আর স্টিল নট হিপনোটাইজড!

বড় বড় দুই চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে যাজ্ঞসেনী।

তোমার কোনো শেষ ইচ্ছা নেই যাজ্ঞসেনী?

শেষ ইচ্ছে! ইচ্ছের কি শেষ আছে?

তা বটে। তবে কিনা একজন ফাঁসির আসামীকে তার শেষ ইচ্ছের কথা জিজ্ঞেস করায় সে নাকি কুমড়ো ভাজা খেতে চেয়েছিল।

কুমড়ো ভাজা! মাগো!

কুমড়ো ভাজা যাজ্ঞসেনী। কখনো খাওনি? অমৃত। একটু বেসন মাখিয়ে নিলে...

প্লীজ সুবীর! ফ্যাদরা প্যাচাল শুনতে চাই না।

এবার ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটা বলতে পেরেছো যাজ্ঞসেনী।

দাও।

আজ এই শেষ দিনে তোমার সবাইকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে না?

ক্ষমা! কাকে ক্ষমা? কেউ তো ক্ষমা চাইছে না!

চাইছে যাজ্ঞসেনী। সমস্ত পৃথিবী তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইছে।

ধ্যাত।

প্রত্যেক মৃত্যুপথযাত্রীই এক একজন ভি আই পি। ভিখিরি থেকে রাজা সবাই তখন সমান। তার কাছে মানুষের যত ঋণ ছিল, যত অনাদর করা হয়েছিল তাকে, বেঁচে থাকার লড়াইতে যারা হারিয়ে দিয়েছিল তাকে, যত অপমান করা হয়েছিল, যত বঞ্চনা সে সয়ে গেছে সব কিছুর জন্য পৃথিবী তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। সে হয়তো ক্ষমা করে না, কিন্তু চাওয়া হয়। পৃথিবী তোমার কাছে ক্ষমা চাইছে যাজ্ঞসেনী।

যাজ্ঞসেনী চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। বলে, বেশ, সবাইকে ক্ষমা করলাম।

মিলিকে ?

মিলি! বেশ মিলিকেও।

যাজ্ঞসেনী, তুমি কি জানো যে গ্রামদেশে মাঝে মাঝে গেঁয়ো মেয়েদের ভূতে ধরে ?

আমি ভূতে বিশ্বাস করি না সুবীর।

আহা, বিশ্বাস করার দরকারও নেই। কিন্তু ধরে এটা ঠিক।

তাতে কী ?

ওঝা এসে যখন ভূত ঝাড়ে তখন ভূতটা প্রথমে কিছুতেই যেতে চায় না, কেবল নানা বায়নাক্কা তোলে। ওঝা তখন সপাসপ ঝাঁটা মারতে থাকে, সরষেপোড়া ছিটোতে থাকে...

প্রিমিটিভ।

একদম। ওঝার তাড়নায় শেষ অবধি অবশ্য ভূত যেতে রাজী হয়। তখন ওঝা বলে, কিন্তু যাবি যে তার কী প্রমাণ রেখে যাবি ? ভূত তখন হয়তো বলে, ঈশান কোণের ওই আমগাছটার একটা ডাল ভেঙে দিয়ে যাচ্ছি...

যায় ?

যায় যাজ্ঞসেনী। আমি দেখেছি।

ফ্যাদরা প্যাচাল পেড়ো না সুবীর।

গল্পটা তাহলে প্রতীক হিসেবে নাও যাজ্ঞসেনী।

কিসের প্রতীক ?

মিলিকে যে তুমি ক্ষমা করেছিলে তার একটা চিহ্ন রেখে যাও।

তার মানে ?

মিলি যখন ফিরে এসে তার ঘরে ভাঙচুর আর ওলটপালট দেখবে তখন ভাববে, যাজ্ঞসেনী তো কই আমাকে ক্ষমা করে গেল না!

তুমি খুব দুষ্টু।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট যাজ্ঞসেনী ?

যাজ্ঞসেনী মৃদু হাসল। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, চলো, ওর ঘরটা দুজনে মিলে গুছিয়ে দিয়ে যাই।

চলো যাজ্ঞসেনী।

জেমস ক্লিপ দিয়ে ফের তালা খুলি। ঘরে ঢুকি। বিধ্বস্ত ঘরখানার দিকে একটু চেয়ে থাকি দুজনে। তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলি।

যাজ্ঞসেনী বলে, ইটস রিয়েলি এ মেস। কিন্তু আমি যে কখনো ঘরটর গোছাইনি সুবীর! পারব তো ?

পারবে যাজ্ঞসেনী। মেয়েদের মধ্যে ঘর গোছানোর প্রতিভা জন্মসূত্রেই থাকে। সুযোগ পেলেই ফেটে বেরিয়ে আসে।

আংসাং বোকো না। কোনটা আগে করব বলো তো! ওয়ার্ডরোব ?

মন্দ কি ?

যাজ্ঞসেনী ওয়ার্ডরোবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। আমি চারদিক থেকে জিনিস কুড়িয়ে এনে দিতে থাকি। ও গোছায়। গোছাতে গোছাতে একসময়ে একটু ফুঁপিয়ে ওঠে।

কী হল যাজ্ঞসেনী ?

আমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি!

কেন যাজ্ঞসেনী ?

তুমি বুঝবে না।

ওয়ার্ডরোব শেষ করে যাজ্ঞসেনী টেবিলটা সাজাতে সাজাতে ড্রয়ার থেকে চিঠির গোছাটা বের করে আবার। আমার দিকে তাকায়, তারপর ফের গোছাটা ড্রয়ারে রেখে দিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে, মোটে একাশিখানা।

আমি তাড়াতাড়ি বলি, আমি অত লিখিনি। আমার মোটে সাতখানা।

জানি। আমার গোনা হয়ে গেছে। সব লাভারের চিঠি মিলিয়ে মিলির মোটে একাশিখানা।

তোমার কত ?

গোনা কবে ছেড়ে দিয়েছি! কয়েক হাজার হবে হয়তো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যাজ্ঞসেনী।

যখন হাই তুলতে তুলতে আর চোখ রগড়াতে রগড়াতে দুজনে কাচের শো-কেসটা সাজাচ্ছি তখন যাজ্ঞসেনী হঠাৎ চমকে উঠে আমার হাত চেপে ধরে,

কে বলো তো !

কোথায় কে ?

কার গলা পেলাম যেন ! বলে উঠল, কে ?

আমি মাথা নাড়লাম, কে নয় যাজ্ঞসেনী। কা।

কা ? তার মানে কি ?

কাক ডাকছে।

কাক। কাক কেন ডাকবে ?

সেরকমই প্রথা আছে যে। ভোর হলে কাক ডাকবেই।

ভোর ! ভোর হয়ে গেল এর মধ্যেই ? কী সর্বনাশ !

রাতের শেষে যদি ভোর না হয় তাহলে তো আরো সর্বনাশ যাজ্ঞসেনী !

কী হবে এখন বলো তো ! আমার যে আজ রাত্রেই প্রোগ্রাম করা ছিল। নদী বা সমুদ্রের ধারে, গাছপালার মধ্যে, কুয়াশা, পাখির ডাক....

যাজ্ঞসেনী ফের হাই তুলল।

আমি অতি কষ্টে একটা হাই গিলে ফেলে বললাম, লগ্নভ্রষ্টা কাকে বলে জানো যাজ্ঞসেনী ?

না তো ! কী ভ্রষ্টা বললে ?

গাঁয়ে গঞ্জে যেসব মেয়ের বিয়ের লগ্নে বর আসে না তাদের বলে লগ্নভ্রষ্টা।

বর আসে না কেন ?

অনেক সময় পণ বা দানসামগ্রী নিয়ে ঝগড়া হয়, বর তুলে নিয়ে যায় পাত্রপক্ষ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। ডাউরির এগেনস্টে আমরাও তো মুভমেন্ট করছি।

খুব ভাল। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে লগ্নভ্রষ্টাদের আর বিয়ে হয় না।

খুব খারাপ সিস্টেম।

তা তো বটেই। কিন্তু তুমি আজ লগ্নভ্রষ্টা যাজ্ঞসেনী।

তার মানে ?

তোমার লগ্ন বয়ে গেল, বিয়ে হল না।

এ মা ! কী বলে রে ছেলেটা ! বিয়ে আবার কি ?

তোমার সঙ্গে আজ মৃত্যুর বিয়ে ছিল যাজ্ঞসেনী।

যাজ্ঞসেনী বড় বড় চোখ করে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আমার দিকে। তারপর হেসে ফেলে, দুষ্টু কোথাকার। কিন্তু বিয়েটা হবে। দেখো।

মহাজনেরা কী বলেন জানো ?

কী ?

ঘুমও একরকমের মৃত্যু। ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর ছায়া আছে।

তাই বুঝি ?

বড় মৃত্যুর বদলে এখন ছোটো করে একটু মরলে হয় না যাজ্ঞসেনী ?

যাজ্ঞসেনী হাই তুলে বলে, তোমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে বুঝি ! আমারও।

তাহলে ?

এক মাতাল ঘুমে সম্পূর্ণ আউট হয়ে যাওয়ার আগে সেই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে শেষ কথা।

একটা বেড়ালের গলা ভেঙে গেছে। বিচিত্র এক গলায় সেটা ডাকছিল, গুরুং ! গুরুং ! গুরুং !

আমি জীবনে কোনো বেড়ালকে এরকম ডাকতে শুনিনি। ঘুমের অতল থেকে মাঝে মাঝে হাত তুলে অলস গলায় বলছি, যাঃ ! যাঃ !

বেড়ালটা যাচ্ছে না। কেবল ডাকছে, গুরুং ! গুরুং !

দুর্বল উপোসী জিম অবশেষে শিকল নাড়া দিল, টের পেলাম। খোনা স্বরে বেড়ালটাকে ধমকাল, ঘ্রাঁউ ! ঘ্রাঁউ।

বেড়ালটা তবু যাচ্ছে না।

ঘুম ভেঙে সচকিতে উঠে বসি। বেড়াল নয়। দোতলার জানালায় এক অলৌকিক মানুষের মুখ।

চাপা জরুরী গলায় ট্যাপা বলে, গুরু ! আচ্ছা ঘুম মাইরি। কখন থেকে ডাকছি। পাইপ বেয়ে উঠে গ্রীল ধরে ঝুলে আছি পাক্কা চল্লিশ মিনিট।

কী চাস ট্যাপা ?

কেসটা কি গুরু ?

কিসের কেস ?

গুড়িয়াটা কে ? চিমনি ?

কে গুড়িয়া ?

মোটরওয়ালী গুড়িয়া দোস্ত ! মালটা কে ?

কী চাস ট্যাপা ?

কিছু মাল ঝাঁকতে এসেছিলাম গুরু। ভোর রাতে ওঘরে উঁকি মেরে দেখি এক নীল গুড়িয়া মিলির বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়ির সামনে লাল মোটর। কেসটা কী ? চিমনিকে ফের ইন করালে ?

এলে কি তাড়িয়ে দেবো ?

চিমনির গাড়ি আছে সেকথা আগে বলোনি কেন দোস্ত ?

বললে কী করতি ?

আরো রেসপেক্ট করতাম।

চিমনিরা ঘ্যামা লোক আছে ট্যাপা। ওর বাবার চারটে কারখানা।

মর গয়া দোস্ত। ওরকম মেসো থাকতে তুমি শালা গরুর ঘাস কাটছো কেন ?

কী চাস ট্যাপা ?

গদাইয়ের কুকুরটা আমাকে মার্ক করছে দোস্ত।

ও কিছু করবে না। তুই এখন যা ট্যাপা।

দাঁড়াও দোস্ত, কথাটা শোনো।

আবার কী কথা ?

চিমনির বাবার কটা কারখানা বললে ?

চারটে।

দোস্ত। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে মনে আছে ?

কী কথা ট্যাপা ?

চিমনিকে আমার সঙ্গে.....

তা আর হয় না রে ট্যাপা।

কেন হবে না গুরু ?

তুই সতীশ মাস্টারের ছোটো মেয়ে ময়নার প্রেমে পড়েছিস।

কে সতীশ মাস্টার দোস্ত ? কে ময়না ?

ময়নার চোখের দেয়ালায় তোর মস্তানী ফুটে গিয়েছে সেদিন। ভুলে গেলি ?

তোমার কেস আমি করে দেবো দোস্ত। চিমনি কি স্বপ্ন গুরু ?

তার মানে ?

চারটে হেমা, সাতটা রেখা, দশটা শাবানা এক করলে তবে চিমনি ! মাইরি গুরু, তোমার মাসতুতো বোন বলে বলছি না, এ হচ্ছে ড্রিম। আমি শালা হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিলাম। ওর জন্য লাখো লাশ নামানো যায়।

তোর দ্বারা হবে না ট্যাপা।

কী হবে না গুরু ?

তুই পারবি না ট্যাপা। এখন যা।

তুমি বিশ্বাস করছো না গুরু ?

এখনো তুই জাতে উঠিসনি ট্যাপা। তোর বন্দুক, পিস্তল নেই, এখনো তুই বোমা বাঁধতে শিখিসনি। তুই ক্যারাটে কুংফু জানিস না। শুধু হাত চালাচালি করে কি এ যুগে মস্তান হওয়া যায় রে ?

কথাটা অন্য কেউ বললে তার জবান খেঁচে নিতাম। কিন্তু তুমি দোস্ত, আমার কিছু সিক্রেট জানো।

জানি ট্যাপা। তবে ব্ল্যাকমেল করব না। সতীশ ঘোষকে মারার লোকের অভাব নেই। পুপুর মেলা টাকা আছে, কলকাতায় গুণ্ডারও অভাব নেই। তুই যা।

ট্যাপা গর্জন করে ওঠে, কেসটা আমার গুরু ! আর কেউ হাত দিলে হাত উড়িয়ে দেবো।

অত লাফাস না ট্যাপা। হাত ফসকে পড়ে যাবি।

গুরু।

বল।

চিমনিকে বলবে তো !

কী বলব ?

কিশোরের মতো গলা, বিনোদ খান্নার মতো চেহারা, আর দুটো মার্ডার চার্জ....

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

জানালা থেকে ট্যাপার মুখ খসে যায়। লালচে একটু আলোর আভা এসে পড়ে। ভোর হচ্ছে।

॥ ছয় ॥

পুকুরের ধারে জংলা জমির মধ্যে পড়ন্ত বেলায় একটা মানকচু সাপটে টেনে তুলতে হিমসিম খাচ্ছিলেন সতীশবাবু। ছাইগাদা, কাঁটাঝোপ, নর্দমার থিকথিকে গড়ানো জলে দুর্গম জায়গা। চারদিকে বিশাল বিশাল কচুপাতার অবরোধ।

স্যার।

কেডা রে ?

আমি সুবীর স্যার।

কোন্ সুবীর ?

সেই যে স্যার, আর একদিন এসেছিলাম।

অ। তা আইজ আবার কী মতলবে ?

একটু হেল্প করব স্যার ? কচুটা বোধহয় ভীষণ ভারী !

মানকচু ভারীই হয়। বিশ পচিশ সের হাইস্যা খেইল্যা। হেলপ করবা ? তা

করো।

বলতে কি ছেলেবেলা থেকেই কচু ঘেঁচুর সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়। জলে জঙ্গলে শাকপাতা, কচু, মেটে আলু খুঁজে খুঁজে শৈশব কাটেনি কি? একটু নেড়েচেড়ে গোড়া আলগা করে নিয়ে প্রকাণ্ড কচুটা ধীরে ধীরে তুলে দিলাম।

মানকচু বাটা খাইছ কোনোদিন?

খেয়েছি স্যার।

কেমন লাগে?

দারুণ।

দারুণ! ঢাকার কচু তো খাও নাই।

না স্যার, আমার জন্ম কলকাতায়।

তুমি বাঙ্গাল না ঘটি?

ফরিদপুরে দেশ ছিল স্যার। তবে আমরা....

তোমরা যে কী হেইরে তোমরাই জান না। নো আইডেনটিটি। বাঙ্গালেরও আইডেনটিটি আছে, ঘটিরও আইডেনটিটি আছে। এই কলকাত্তাইয়াগুলারই নাই। বোঝলা কিছু?

একটু একটু স্যার।

কচুবাটায় কী কী লাগে কও তো।

নারকোল স্যার। আর সরষেবাটা।

আর?

কাঁচালঙ্কা আর একটু চিনি। আর সরষের তেল।

আর একটা জিনিসও লাগে। আমার মত বুড়া হইলে বুঝবা হেই জিনিসটা না হইলে কচুবাটা কচুবাটার মত লাগে না।

জিনিসটা কী স্যার?

দ্যাশের মাটি আর মায়ের হাতের গন্ধ। বোঝলা?

বুঝলাম।

সতীশবাবু দু হাতের বুড়ো আঙুল আমার নাকের সামনে নেড়ে বললেন, কিছু বোঝো নাই। দ্যাশের মাটির গুণ বোঝবা ক্যামনে? তোমার তো দ্যাশই নাই। আর মা কেমন জিনিস হেইরে কি আইজকাইলকার পোলারা নি ফিল করে? করে স্যার।

কচু করে। বউ পাইলেই হারামজাদারা মা-বাপরে লাথি মাইরা যায় গিয়া। মায়ের হাতের গন্ধখান কেমন বোঝবা কিসে?

বলে সতীশবাবু একটা দা দিয়ে কচুর মাথা থেকে পাতাগুলো কেটে ফেলতে লাগলেন।

একটু বাদে নরম সুরে বললেন, তোমার ছুটি ফুরায় নাই?

ফুরিয়ে এসেছে স্যার। কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি।

যাও, পলাও। বেঙ্গলে কেউ থাইক্যো না। এইখানে মানুষ থাকে না।

জবাব না দিয়ে চারদিকটা একটু আনমনে ঘুরে ঘুরে দেখি। তারপর খুব মৃদু গলায় বলি, এই দিকটায় একজন বুড়ি থাকত না স্যার?

বুড়ি! তোমারে কে কইল?

কেউ না স্যার। আমরা জানি। আমরা তো এখানকার আদি বাসিন্দা।

সতীশবাবু কচুর দিকে মনোযোগ দিয়ে বললেন, থাকতে পারে। বুড়িধুড়ির খবর রাখে কেডা?

এই মাঠের ধার দিয়ে সন্ধের পর যাওয়ার সময় অনেকে ভূতের ভয় পেত। আমরা রাম নাম করতে করতে দৌড় দিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যেতাম। লোকে বলে বুড়ির অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল।

প্রায় আট-দশ কেজি ওজনের কচুটা তুলবার চেষ্টা করছিলেন সতীশবাবু। দুবার কচুর আঁঠালো গা থেকে তার আঙুল পিছলে গেল।

বুড়িধুড়ির খবর দিয়া কী কাম? অখন বাড়িত যাও।

যাই স্যার। গড়াইবুড়ির কথা কি আপনি ভুলে গেছেন স্যার?

সতীশবাবু কচুটা ছেড়ে কপালের ঘাম মুছলেন। বললেন, গড়াইবুড়ি? আছিল বোধহয় একজন। আবছা আবছা মনে পড়ে। অনেক কালের কথা তো।

এইসব জমিজমা তারই ছিল, তাই সবাই তাকে এখনো এক ডাকে চেনে। আমার বাবা তাকে পিসি ডাকত। বাবার মুখেই শুনেছি, বুড়ির সেই জমি একজন গাপ করে।

দেখ হে বাপু, বেশি কথা কইও না। সেই সস্তার আমলেও বুড়ি তিনশ টাকা কইরা কাঠা নিছিল। চাইরদিকে ডোবা, পগার, জঙ্গল, মশা, শিয়াল, জোক, ব্যাং, চোতরাপাতা, কেউ ছুইত নাকি এই জমি? কড়কড়া বিশ হাজার টাকা গুইন্যা দিছি। হেইটা কি গাপ করা হইল নাকি? তোমার বাবায় তো দেখতাছি মস্ত পণ্ডিত। অখন যাও তো বাপু, সইরা পড়।

রাগ করলেন স্যার? আমি তো ভেবেছিলাম, জমিটা গাপ করেছিল অন্য লোক। আপনি তার কাছ থেকে কিনেছিলেন।

পাচ চল্লিশ বছর থানা গাইড়া আছি হে এইখানে। ইয়ার্কির কথা না।

তবে স্যার, গড়াইবুড়িকে চিনতে পারছিলেন না কেন?

সতীশবাবু ফের কচুটা তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। কেজি দশেক ওজন তাঁর মতো বয়সের লোকের পক্ষে খুব কম নয় বটে, কিন্তু তবু তুলতে না পারার মতোও নয়।

কচুটা আমি ঘরে দিয়ে আসছি স্যার। আপনি রাখুন।

রাখ রাখ, আর দরদ দেখাইতে হইবো না। অখন কও তো তোমার মতলবখান কী?

কিছু না স্যার।

গড়াইবুড়ির কথা তবে ওঠে ক্যান?

খুব অবাক হয়ে বলি, গড়াইবুড়ির কথা তো এখনো সবাই বলাবলি করে।

সতীশবাবু একটা ঢোঁক গিললেন, কী কয় মাইনষে?

বলে গড়াইবুড়িকে কে বা কারা এক রাত্রে গলা টিপে মেরে রেখে গিয়েছিল।

কইলেই হইল? বুড়া বুড়িরা এমনেই মরে।

গড়াইবুড়ির গলায় আঙুলের ছাপ অনেকে দেখেছে।

কেডা কেডা? নাম কও।

অনেকে স্যার। তখন সেটাই ছিল টক অফ দি টাউন। গড়াইবুড়ি মরার পরই তার ভিটেটা আর একজন এসে দখল করে।

মহেন্দ্র ঘোষ। দখল তো আর জবরদস্তি করে নাই। আমার লগে কথাই আছিল বুড়ি মরলে তার ভিটাখান আমি নিমু।

বুড়ি যতদিন বেঁচে ছিল খুব শাপশাপান্ত করত।

বুড়িগো স্বভাব যাইবো কই। গাইল দেয়, শাপ দেয়, চাক্কা মারে। বাপু হে, পুরানা কাসন্দ ঘাইট্যা লাভ নাই।

ঘাঁটছি না স্যার, মনে পড়ল তাই বললাম। বাইরে থাকি বলে এ জায়গাটার কথা খুব ভাবি তো। তাই সব মনে পড়ে।

ভাল। অখন যাও, আমার কাম আছে।

তাড়িয়ে দিচ্ছেন স্যার?

না খেদাইলে কি যাইবা? তখন থিকা কেবল টিকটিক করত্যাছ। কথার মইধ্যে কথা নাই, কেবল বুড়ির হেনা বুড়ির তেনা।

বুড়িকে নিয়ে যে আবার কথা উঠেছে স্যার!

কচুটা তিনবারের বারও মিস করলেন সতীশবাবু, আবার কথা উঠছে? এত

কথা ওঠে ক্যান? কিসের কথা?

লোকের যে সন্দেহ হয় স্যার।

কিসের সন্দেহ?

যে লোকটা বুড়িকে খুন করেছিল সে আজও বেঁচে আছে।

মহেন্দ্র ঘোষ? তোমারে কে কইছে? মহেন্দ্র মরছে দশ বছর আগে।

খুনটা কি মহেন্দ্র ঘোষ করেছিল স্যার?

কচুটার জন্য নিচু হয়েও আবার ছিটকে দাঁড়ালেন সতীশ ঘোষ, ক্যান, মহেন্দ্র খুন করব ক্যান?

এই যে বললেন!

কখন কইলাম? তুমি বাপু যাইবা কিনা কও তো। এই পাড়ার পোলারা কিন্তু ভাল না। একখান ডাক দিলে মার-মার কইরা আইয়া পড়ব।

আমি আপনার ছাত্র ছিলাম স্যার।

গোটা পরগণায় আমার মেলা ছাত্তর। ছাত্তর বইল্যা কি মাথা কিন্যা নিছ নাকি?

মাস্টারমশাই হয়ে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে নিজের ছাত্রকে মার খাওয়াবেন?

বেয়াদবি করলে আর উপায় কী?

বেয়াদবি হবে কেন স্যার? এ পাড়ার অনেকেও তো কথাটা বলে বেড়াচ্ছে।

মিছা কথা। কেউ কিছু জানে না।

তা অবশ্য ঠিক। আপনি ছাড়া আর বিশেষ কেউ কিছু জানে না। শুধু গুজব ছড়ায়।

তইলে? অখন বোঝলা তো!

মাথা নাড়লাম, না স্যার, বুঝিনি। গড়াইবুড়ি যদি খুনই না হবে তাহলে এত বছর পরও লোকে কথাটা তুলছে কেন? কেনই বা পোস্টার দেওয়ার তোড়জোড় চলছে?

কিসের পোস্টার?

গড়াইবুড়ির হত্যার তদন্ত চাই, গড়াইবুড়ির হত্যাকারীর কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও···এইসব।

কোন আহাম্মকে এই পোস্টার দিব?

সবাই আহাম্মক নয় স্যার। অনেকে বলে গড়াইবুড়ির ডেথ সার্টিফিকেটে কেউ সই করেনি। তাকে এমনিই মাঠের ধারে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মিছা কথা। বুড়ির ডেথ সার্টিফিকেট লেখছিল রহমান ডাক্তার। বুড়া মানুষ।

সাচ্চা লোক।

বুড়ো রহমান স্যার?

তবে আর কেডা ডাক্তার আছিল এইখানে? ধন্বন্তরি। তবে শ্যাষ বয়সে চোখে দেখত না, কানেও শুনত না। লেখতে হাত কাইপ্যা কাইপ্যা যাইত। তবু লেইখ্যা দিছিল।

সেইজন্যই তো লোকের আরো সন্দেহ। রহমান ডাক্তার চোখে দেখত না। তার সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই।

মাইনষের কথার বড় মূইল্য! অখন দিক কইরো না বাপু, যাও। খাড়াও তোমারে একখান নাইরকল দিয়া দেই। আমার গাছের নাইরকল, খুব মিষ্টি। মায়ে নিজের হাতে গাছখান লাগাইছিল।

নারকোল স্যার? না থাক।

সতীশবাবু ভারী আদরের গলায় বললেন, ক্যান থাকব ক্যান? বাজারে নাইরকলের যা দাম! একখান লইয়া যাও। কোরাইয়া মুড়ির লগে খাইও। নাড়ু তক্তি তো আর একখান নাইরকলে হইবো না।

কচুটা তুলতে গিয়ে সতীশবাবু হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর উঠে বললেন, বড় পিছলা।

আমি মৃদু হাসলাম। হাতে দা তবু সতীশবাবুর বুদ্ধি কাজ করছে না। কচুটা তিনটে বা চারটে টুকরো করলেই বহন করা সহজ হয়ে যায়। তবু এই সহজ উপায়টা ওঁর মাথায় আসছে না।

মহেন্দ্র ঘোষ কাজটা না করলেও পারত স্যার।

কচুটার দিকে হতাশভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সতীশবাবু বললেন, কোন কাজটা?

বুড়ি তো এমনিতেই মরত। বয়স হয়ে গিয়েছিল নব্বুইয়ের কাছাকাছি।

তোমারে কইছে! বুড়ির তাকত তো দেখ নাই। রোজ তিন বালতি গোবরের ঘুইট্যা দিত। ডালপালা কুড়াইয়া ভুর করত রোজ মন খানেক কইরা। গরুর দুধ দোয়াইয়া নিজে লইয়া গিয়া বাড়ি বাড়ি বিক্রি করত।

স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলুন।

স্বাস্থ্য, ওরে বাবা, আমাগো জুয়ান বয়স তখন, বুড়ির লগে দমে পারতাম না।

তবে স্যার, বুড়ি হঠাৎ মরে গেল কেন?

সতীশবাবু আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন, মরল কেন? মাইনষে মরে ক্যান? মরণের সময় হইলেই মরে। বুড়ির হইছিল সন্ন্যাস। তোমাগো

সেরিব্রেল আর কি।

রহমান ডাক্তার কি তাই লিখেছিলেন?

সতীশবাবু মাথা নাড়লেন, মনে নাই। কচুবাটা কেমন খাও?

দারুন স্যার।

একটু লইয়া যাইও, নাইরকল দিয়া, কাচামরিচ দিয়া···বোঝলা এইসব জিনিস ঢাকায় যেমন স্বাদ আছিল তেমন এইখানে নাই।

ওটা স্যার আপনার সংস্কার।

সতীশবাবু বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন, তাই হইব। তবে কিনা সংস্কারও কম কথা না। তোমার মা যে তোমার মা, বাপ যে বাপ হেইটাও সংস্কার। তাই বইল্যা কি আর সম্পর্ক তুইল্যা দেওন যায়?

কথাটা ঠিক স্যার।

তবে জমি বড় জব্বর আছিল হে। দেশে তো যাও নাই। আমাগো দেশের বাড়িতে ছঞ্চাতলায় একখান মানকচু তুলছিলাম একবার। বিশ্বাস করবা না। পাক্কা ত্রিশ সের। খাইয়া শেষ করতে পারি না। পোস্টার কারা লেখব কইলা?

পাড়ার লোক।

খাড়াও পোলাগুলিরে আইজই কমু। মৃগাঙ্করেও একটু এলার্ট করতে হইব।

আপনার বড় ছেলে স্যার, ওদের পক্ষে।

কাগো পক্ষে?

মানে পোস্টার পার্টির পক্ষে।

অকাল কুষ্মাণ্ড। জুতাইয়া দিতে হয়। কী কয় গর্ভস্রাবটায়?

ওঁরও সন্দেহ স্যার।

কিসের সন্দেহ?

খুনটা হয়েছিল স্যার।

যখন হইছিল তখন তো গর্ভস্রাবটায় মাটির লগে কথা কয়। ও জানে কী?

লোকের কাছে শুনেছে।

সতীশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চারদিকে পাতলা কুয়াশার আবরণে ভুতুড়ে অন্ধকার নেমে আসছে। জলেজঙ্গলে জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে জোনাকি পোকা। উত্তুরে হিম বাতাস নারকোল গাছের পাতায় শব্দ করে গেল।

কচুটা সতীশবাবু তুলতে পারছেন না। চেষ্টা করছেন।

আপনি কষ্ট করবেন না স্যার। আমি তুলে দিয়ে আসছি।

কবে মহারাষ্ট্রে যাইবা যেন কইলা!

কয়েকদিনের মধ্যেই।

ভাল। বেঙ্গলে থাকবা ক্যান? বেঙ্গল ইজ ডেড। আমাগো বারটা বাজাইল কে জান? গান্ধী আর জিন্না।

তা বটে।

সতীশবাবু শক্ত করে দা চেপে ধরলেন। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, বেঙ্গল ইজ ডেড। মাউড়ারা হগ্গলই দখল করব। আমাগো কথা পার্লামেন্টে কইব কে কও। শ্যামাপ্রসাদ ইজ গন, বিধান রায় ইজ গন, নেতাজীরে তো মাইরাই ফেলাইল...

কেউ নেই স্যার।

হেই তো কই। বেঙ্গল ইজ বিয়িং পারচেজড বাই আদার পিপল। বোঝলা? হেই পাচচল্লিশ বছর আগেও এক মাউড়া আইয়া এই জমি দখল নিতে চায়। গড়াইবুড়ি তো তারেই প্রায় বেইচ্যা দিছিল।

তারপর?

মাঝখানে আমি আইয়া সময়মত পড়লাম। বুড়িরে অনেক বুঝাইলাম।

বুড়ি বুঝল স্যার?

বুঝল।

বুড়িটাকে মারার দরকার ছিল না স্যার।

সতীশবাবু আবার কচুটা তুলতে নিচু হলেন। মুখটা আড়াল হল। একটু ধীর স্বরে বললেন, দরকার আছিল। তুমি বোঝবা না। দরকার আছিল। আমারে চাইর বিঘা বেইচ্যাও বুড়ির অনেক জমি আছিল। হেইরে কিননের পয়সা কই পামু? বুড়ি তখন মাউড়াটারে বেইচ্যা বহে আর কি।

তারপর স্যার?

মহেন্দ্ররে দেশ থিক্যা আনাইলাম। সাক্ষাৎ ডাকাইত। কত মাইনষের যে গলা কাটছে।

আপনার কষ্ট হল না স্যার?

হইল। হইবো না ক্যান? তবে ইট ওয়াজ ফর বেঙ্গল।

বুঝেছি স্যার।

সতীশবাবু কচু তুলতে নিচু হয়ে সেই যে মুখ লুকিয়েছেন আর তুললেন না। ধীর স্বরে বললেন, অখন যাও। আমারে একটু একা থাকতে দাও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। চারধারে বড় বড় কচুপাতার অবরোধ। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কুয়াশা। শীত। সতীশবাবু উবু হয়ে বসে কচুটার গায়ে হাত

বোলাচ্ছেন।

আমার আর কিছু দেখার ছিল না। ধীরে ধীরে পিছু ফিরে হাঁটতে লাগলাম। মাথাটা অবসন্ন। শরীর ভার। শীত করছে। দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টির দিন। বারান্দায় নীলডাউন হয়ে বসে আছি। সতীশবাবু মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

পিছনে কচুপাতায় একটা ঝটাপটির শব্দ হল কি? একটা অস্ফুট চিৎকার?

আমি ফিরে তাকালাম না। জোর কদমে হেঁটে বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে মাঠ পেরোতে লাগলাম।

॥ সাত ॥

ভূত দেখা চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিল পুপু। মুখ শুকনো। চোখ বসা। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, হয়ে গেছে?

হ্যাঁ পুপু।

শুনে পুপু টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে নিজের চুল দুহাতের মুঠোয় খামচে ধরল। টেবিলের ওপর নিজের অস্থির মুখ ঘষতে লাগল বারবার। ওর শরীর বার বার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কান্নায়। তারপর স্থির হল। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ বাদে খুব ধীরে ধীরে মুখ তুলল পুপু। সেই মুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। করমচার মতো লাল দুই চোখ। ঠোঁট কাঁপছে।

পুপু তার ড্রয়ার খুলল।

আমি বললাম, আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল পুপু। তার নাম ট্যাপা।

পুপু হাত তুলে আমাকে থামিয়ে বলল, আমি কিছু শুনতে চাই না কানু। নো ডিটেলস। নাথিং।

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝেছি।

পুপুর দেওয়া টাকার বাণ্ডিল পকেটে ভরে উঠে দাঁড়াই। বলি আবার কখনো দরকার হলে...

না কানু। তুই যা। প্লীজ যা—

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝেছি। কিন্তু আমি জানি এর পরের বার পুপুর আর এত কষ্ট হবে না। কান্না পাবে না। তারপরের বার শোক আরো কমে যাবে।

না, ভুল বললাম। পুপুর হয়তো আমাকে সত্যিই আর দরকার হবে না। কারণ আমার মনে হয় না সতীশবাবুর মতো তেড়িয়া, ঘাড়শক্ত এবং আহাম্মক আর কোনো অদূরদর্শী বাঙালী আছেন।

চলি পুপু।

যা কানু।

ফিরে এসে আমি টাকাগুলো গুনতে বসি। ঠিকঠাক দশ হাজার। কারো কোনো ভাগ নেই। কেউ চাইবে না।

যেসব মালমশলায় খুনী মস্তান তৈরি হয় তার কিছু অভাব ট্যাপার মধ্যে তো ছিলই। দয়া মায়া প্রেম মমতা ইত্যাদি যেসব খানাখন্দে মানুষ যখন তখন পড়ে যায় খুনী বা মস্তানদের সেরকম পড়তে নেই। বাজারের মোড়ে একটা ল্যাংড়া বাচ্চা ভিখিরিকে ও রোজ পয়সা দিয়ে আসত। একজন ধূপকাঠির ফিরিওলার কাছ থেকে ফি হপ্তায় ধূপকাঠি কিনত অকাজে। বাসে ট্রামে ও প্রায়ই বুড়োদের সীট ছেড়ে দিত। ট্যাপা নামক যন্ত্রটিকে আমি খুব ভালভাবে চিনতাম। তাই তার নিয়তি কোথা দিয়ে এল তা কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় না আমার। সতীশবাবুর হাতে একখানা ধারালো দা ছিল। ট্যাপা অন্ধকারে সেটা দেখেনি। তার চোখে ভাসছিল জয়া ভাদুড়ির মতো ময়নার দুখানা চোখ। একটু দ্বিধা ছিল মনে। দ্বিধা ছিল হাতে পায়ে।

শেষ অবধি হয়তো ছোরাটা বসাতে পারত না ট্যাপা। জাতে ওঠার জন্যও না। চিমনির জন্যও না। শেষ মুহূর্তে হয়তো পড়ে যেত 'বুড়ো মানুষকে মারব ?' গোছের কোনো দুর্বলতার খাদে। তখন সতীশবাবু মুখ তুলেই দেখতে পেয়েছিলেন তার নিয়তিকে। শেষ বাঙালীর উচ্ছেদ ! বিক্রমপুরের সেই গাঁয়ে শকুনের ছায়া !

একদিকে দা, আর একদিকে ছোরা। অন্ধকার, কুয়াশা, শীত।

চুয়াত্তর বছরের সতীশবাবু বিশাল সেই মানকচুর বুক ভিজিয়ে দিয়েছিলেন অঢেল রক্তে। স্বরচিত বিক্রমপুর থেকে জ্যান্ত অবস্থায় এক চুলও নড়েননি তিনি। ট্যাপা দুদিন লড়েছিল হাসপাতালে। ডিলিরিয়ামের মধ্যেও জ্ঞান ফিরে আসত মাঝে মাঝে। বলত, দোস্ত, শোলে ডেথ সীনে অমিতাভ জয়াকে কী বলেছিল বলো তো।

মনে নেই ট্যাপা।

আঃ কী যেন বলেছিল মাইরি !···মনে পড়ছে না···

কখনো বলত, অমিতাভ···বুঝলে···ঠিক অমিতাভর মতো লাগছে···ডেথ সীনটা ভাবো···বুকে গুলি···বহোৎ আচ্ছা সীন হ্যায় দোস্ত···

আশ্চর্য এই যে একবারও চিমনির কথা বলেনি। শুধু বলত, জয়ার যা চোখ···মরে ভি সুখ আছে···মগনা আসেনি দোস্ত ?···

আসেনি। সে কথা বলা হয়নি ট্যাপাকে। পুলিশ পাহারায় হাসপতালে তার মৃত্যু অবধি না।

যাজ্ঞসেনীকে মিলির ঘরে ঘুমোতে দেখেছিল বুনি। সেইদিন। আমাকে পাগলের মতো নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলে বড় বড় চোখে চেয়ে বলেছিল, মরণ ! ওটা কে গো ? কোত্থেকে ধরে আনলে ?

চুপ বুনি, চুপ। ওর ঘুম ভেঙে যাবে।

অবিশ্বাসভরে বুনি কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল আমার দিকে। তারপর এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গিয়েছিল। আর আসেনি।

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে হাই তুলে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল যাজ্ঞসেনী।

সুবীর ! আমি বেঁচে আছি।

আছোই তো যাজ্ঞসেনী।

অথচ কী স্বপ্ন দেখলাম জানো ?

কী স্বপ্ন যাজ্ঞসেনী ?

খুব উঁচু একটা নির্জন টাওয়ারের ওপর একা চুপ করে বসে আছি। চারদিকে কালো আকাশ। ভীষণ কালো। আর জানো টাওয়ারে কোনো সিঁড়ি নেই। কী করে অত ওপরে উঠলাম তাই ভাবছি বসে বসে। হঠাৎ মনে হল, এটাই তো স্বাভাবিক। আমি তো বেঁচে নেই। কী অদ্ভুত স্বপ্ন বলো। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম ঘুমের মধ্যে।

চা করি যাজ্ঞসেনী ?

করো। উঃ, আজ কত কী করব। নাচবো, গাইবো, লাফাবো।

কেন যাজ্ঞসেনী ?

বেঁচে আছি যে ?

যাজ্ঞসেনীও আর আসেনি। শুধু মাঝে মাঝে ফোন করে।

তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেবো ! উঃ তোমার জন্যই···

কটা প্রেমপত্র পেলে যাজ্ঞসেনী ?

ওঃ, অনেক অনেক। রোজ পাই তো। শোনো মা আর বাবার মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যেতে পারে।

গুড নিউজ যাজ্ঞসেনী।

আফটার অল আমরা অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছি তো। আমাদের মুখ চেয়ে ওঁরা মিটিয়ে নিচ্ছেন। মিটে গেলে আমি কী করব জানো ?

কী ?

রোজ ওদের ঝগড়া লাগাবো।

সেই রাত্রিটার কথা আমার খুব মনে থাকবে যাজ্ঞসেনী।

আমারও। ছাড়ছি সুবীর।

আচ্ছা যাজ্ঞসেনী।

মনশ্চক্ষে দেখতে পাই সেন্ট্রাল রোডের মস্ত জলা জমিতে পুপুদের আর্থমুভার নেমে পড়েছে। নেমেছে বুলডোজার। তাদের মুখে মুখে উড়ে যাচ্ছে কচুবন পগার শাকের ক্ষেত, নারকোল গাছ, মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সতীশ মাস্টারের বাড়ি। বাজারের চেয়ে অনেক বেশী দর পেয়ে উঠে গেছে তাঁর পরিবার। শুরু হচ্ছে নতুন পৃথিবীর নির্মাণ। বিক্রমপুর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে চাকার তলায়। শ্রমিক ও কামিন, সারভেয়ার ও ওভারশিয়ার, ইনজিনিয়ার ও মেকানিক মিলে হাজারটা মানুষ নেমে পড়েছে জলাভূমিতে। বদলে দিচ্ছে কলকাতার রূপ।

আমি বসে থাকি গদাই ডাক্তারের দোতলায়। একা।

বারান্দায় শিকলের সামান্য শব্দ হয়।

জিম।

জিম মুখ তোলে। বড় কষ্টে। জিভ ঝুলে আছে। চামড়া কুঁচকে গেছে। প্রকাণ্ড শরীরে ফুটে উঠছে পাঁজরা। চারদিকে পড়ে আছে মাছ। পচছে গলছে।

আজও জিম শ্রদ্ধার সঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। চারটে পা থর থর করে কাঁপছে। পিছলে যাচ্ছে।

অ্যাকুয়ারিয়ামের শেষ মাছটা ওর নাকের ডগায় দুলিয়ে মুখের সামনে ফেলে দিই। বড় আশায় একটু শোঁকে জিম। তারপর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হেরে যা জিম।

দিশি কুকুরের মতো গলায় জিম সামান্য একটু কেঁউ শব্দ করে। তারপর এগিয়ে যেতে থাকে অবশ্যম্ভাবী ঝিমুনির মধ্যে।

সত্য বটে সবাই হারে না জিম। কেউ কেউ হারে।

জিম লেজ নাড়ল। খুব আস্তে।

একবার, শুধু একবার একটা মাছ মুখে তুলে নে জিম। শুধু একবার।

জিম লেজ নাড়ল।

আমি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলাম। মাংসের ছাঁট, হাড় আর ভিটামিন দেওয়া গমের খিচুড়িটা চড়িয়ে দিইগে। জিম খাবে।